ভাদ্র ১৩৮৪

আনন্দমেলা

পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড : ইন্দ্রনাথ ব্যানার্জী

স্ক্যান ও এডিট করেছেন : সুজিত কুন্ডু

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail : optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com

ইন্সিওরেন্স প্রিমিয়াম আয়কর এ সবের ও নোট রাখুন
শ্রীযুক্ত সেনের ইলেকট্রিক বিল
এ সব কাজও আপনারা করেন?
ব্যাঙ্কে টাকা রাখলে অনেক খুঁটিনাটি ঝামেলা এড়ানো যায়
আমার ছেলের টাকাটা ?
হ্যাঁ এসেছে
ওঁর ছেলে বাইরে চাকরি করেন, ব্যাঙ্ক মারফৎ টাকা পাঠান- ফলে দেরি বা চুরি যাওয়ার ভয় থাকে না
মা মনি আমার গহনা নেবেতো ?
এ হ'ল লকার এখানে অল্প ভাড়ায় মূল্যবান কাগজপত্র ও গহনা রাখা যায়
কি সুন্দর ছোট্ট ছোট্ট পায়রার খোপ
ইউকোব্যাঙ্ক আর কী কী কাজ করে?
আমরা ব্যবসা-বানিজ্য গড়ে তুলতে সাহায্য করি
কী ভাবে ?
টাকা পয়সা ধার দিয়ে ব্যাঙ্ক মারফৎ লেনদেনের সুযোগ দিয়ে

চলবে

আনন্দমেলা

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য মাসিকপত্র
বিজ্ঞপ্তি নং ৩৬৯ (১৬) টি-বি-সি ; তারিখ ১১ জানুয়ারি, ১৯৭৭

ভাদ্র ১৩৮৪ আগস্ট ১৯৭৭ তৃতীয় বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা
দেড় টাকা

গল্প টেনাগড়ে টেনশন । বুদ্ধদেব গুহ ৫
কালোদার গল্প । সুব্রত সেনগুপ্ত ১৪
হরিণের কান্না । অমরেন্দ্র চক্রবর্তী ১৯
চিরঞ্জীব স্যার আর চাঁদের পাথর । শিশিরকুমার মজুমদার ৪২

উপন্যাস অলৌকিক । বিমল কর ৯
বন্ধ ঘরের আওয়াজ । সমরেশ বসু ৩৬

ছড়া মাশাতাশির মামলা । পবিত্র সরকার ৭
সূর্যকে কোলে নিয়ে । প্রীতিভূষণ চাকী ১৫

বিশেষ রচনা ঘুড়ি ওড়াবার দিন । রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ২২

কমিক্‌স মেরু-রহস্য ১৬, নোলেদা ২৬, টিনটিন ৩০, গাবলু ৪১

লেখাপড়া বেলতলা বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান-শিক্ষিকা কী বলেন ৩২
কী ভাবে তৈরি হচ্ছে ক্লাস টেন-এর ফার্স্ট গার্ল ৩৩

খেলাধুলো ইস্টবেঙ্গল দারুণ খেলে জিতেছে । পুষ্পেন সরকার ৪৭
ফুটবলের জাদুকর । মুকুল দত্ত ৪৯
শতবর্ষের সেরা । চিরঞ্জীব ৫১

ধাঁধা-মজা-রহস্য আটখানা ২৮, ধাঁধা ২৮, কিসের ফটো ২৯, কিসের ছবি ২৯,
শব্দ-সন্ধান ২৯

অন্যান্য লেখা আচ্ছা বলো তো । ভানুমতী ৮ ॥ মজার পড়া । কুন্তক ১৮
তোমাদের পাতা ২১ ॥ মণিমেলার খবর ২৪
ডোডো-তাতাই । তারাপদ রায় ২৫ ॥ বিশ্ববিচিত্রা। দিদিমণি ২৫
টগবগে জাদুর খেলা । প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায় ৪৬
আঁকো। রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৪ ॥ শেখো। কারিগর ৫৪

রঙিন ছবি ছোটদের আঁকা ২৭ ॥ ইস্টবেঙ্গলের উলাগানাথন ৫৩

প্রচ্ছদ-চিত্র বিশ্বরঞ্জন রক্ষিত

সম্পাদক : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডএর পক্ষে বাণাদিত্য রায় কর্তৃক
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে
প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড, পি ২৪৮
সি. আই. টি. রোড, কলকাতা-৭০০০৫৪ থেকে মুদ্রিত ।
বিমান মাশুল : ত্রিপুরা ১৫ পয়সা, পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা

HOW TO PAINT WITHOUT A BRUSH

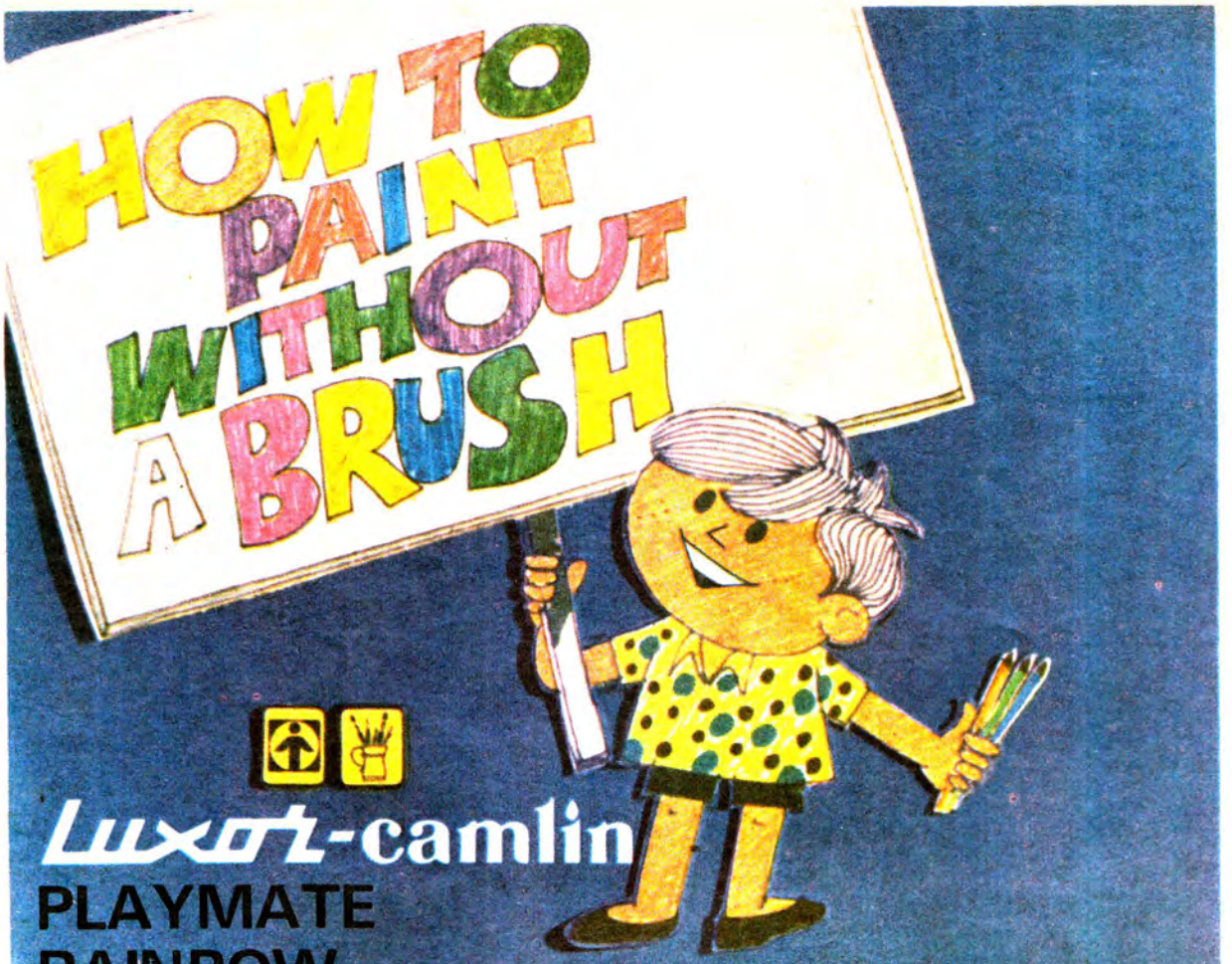

Luxor-camlin

PLAYMATE
RAINBOW
COLORELLA &
COLOUR MASTER

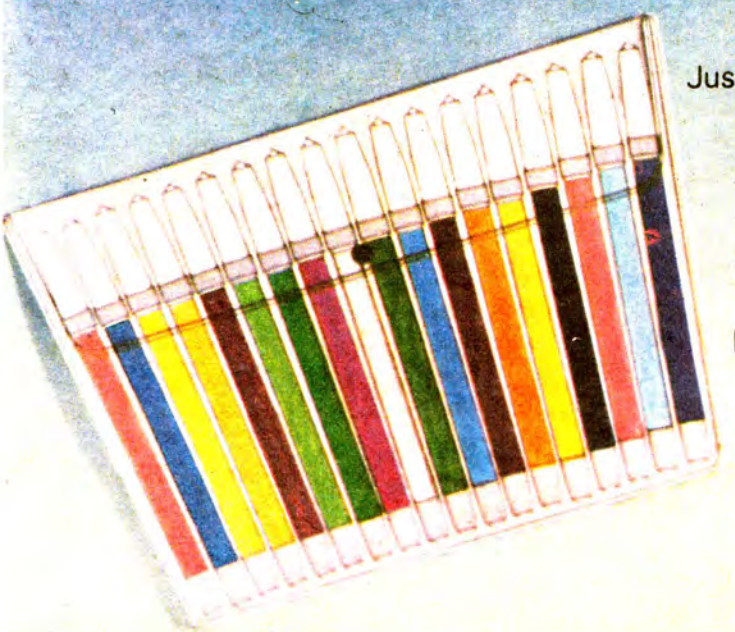

Kids! Raju has found
a new way to paint.
No brush, no water,
no colour tubes, no palette.
Nothing to mess up.

Just a pack of Playmate or Rainbow,
Colorella or Colour master
water colour pens
in 24 delightful shades.

Pull out the pens
from beautiful plastic pouch
& start painting.
Playmate in 12 bright shades
to colour your young ideas.
Colorella water colour pens
in 18 shades.

Luxor-camlin
for a lasting impression.

টেনাগড়ে টেনশান

বুদ্ধদেব গুহ

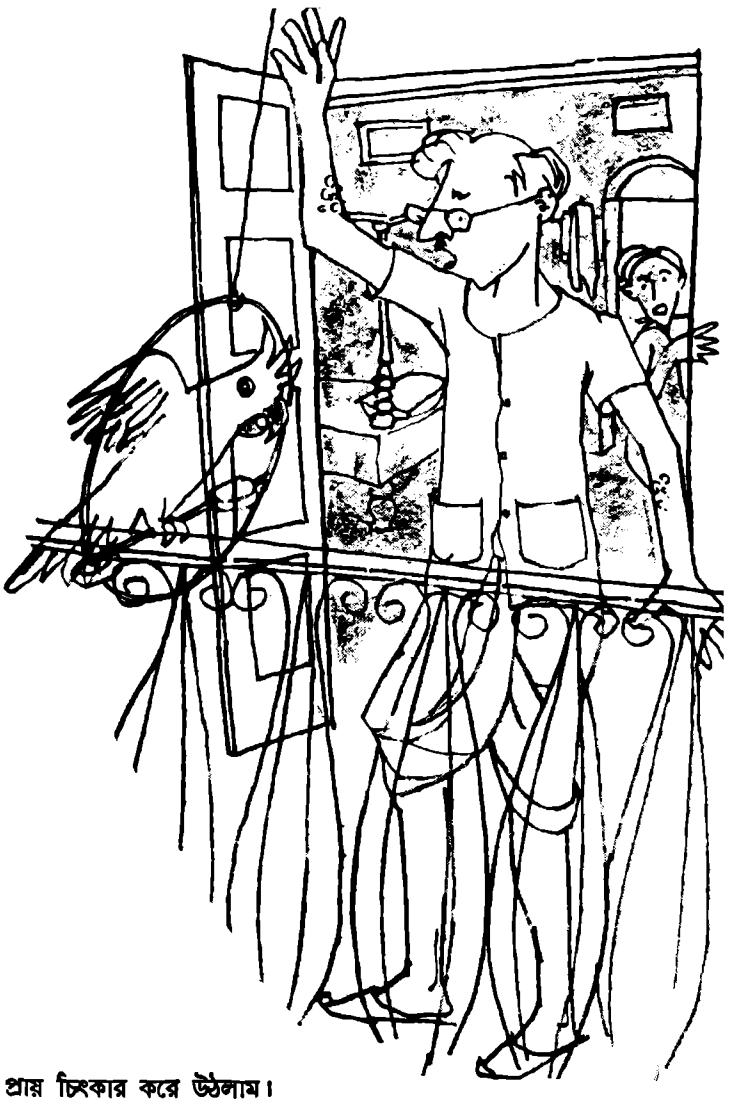

খগা সরকার আর ভগা সরকারকে চিনত না এমন লোক টেনাগড়ে কেউ ছিল না। পাহাড়-জঙ্গল ঘেরা ছোট্ট শহর এই টেনাগড়। এখানে সকলেই সকলকে চেনে।

খগাদার বয়স হয়েছে ষাট-টাট। শৌখিন লোক। যৌবনে বেহালা বাজাতেন, শিকার করতেন, ওকালতিও। পিতৃপুরুষের বহু সম্পত্তি ছিল বিহারের নানা জায়গায়। তাই "খেটে খেয়ে" তিনি জনগণের সামিল হতে চাননি। কিন্তু প্রয়োজন না থাকলেও খাটতে তিনি ভালবাসতেন এবং পরিশ্রমে বিশ্বাস করতেন।

খগাদার ভাই ভগাদার বয়স তিরিশ-টিরিশ হবে। টেনাগড়ে তিনি প্রায়ই নানা ধরনের খবরের সৃষ্টি করে থাকেন। লোকটি ভাল।

খগাদা এখন রিটায়ার্ড। ইদানীং চটের উপরে গুনছুঁচে রঙিন সুতো পরিয়ে "সদা সত্য কথা বলিবে", "ভগবান ভরসা" "যারে রাখো সেই রাখে" ইত্যাদি লিখে-লিখে বস্তির লোকেদের সেগুলো দান করেন। মাঝে-মাঝে কাহার-বস্তির অনিচ্ছুক শুয়োরগুলোকে ধরে এনে কুয়োতলায় তাদের জবরদস্তি সাবান মাখান। সন্ধেবেলায় ও'র বাড়িতে ভজন গান হয়। সকালে দাতব্য হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করেন। খগাদার ডিসপেনসারিতে লোম-ওঠা পথের কুকুর, কুঁজে-ঘা-হওয়া বলদ এবং হাড্ডিসার মানুষ—সকলেই চিকিৎসার জন্যে আসে এবং, আশ্চর্য, কেউ-কেউ ভালও হয়ে যায়।

ছেলেমেয়েও নেই। খগাদা মৃতদার। ভগাদা বিয়েই করেনি। দুই ভাইয়ের সুন-সান্নাটা সংসার। থাকবার মধ্যে একটা অ্যাল-সেশিয়ান কুকুর, তার নাম মোহিনী। চাকর-বাকর আছে, গাই-বয়েল, খোঁত-খামার খিদ্‌মদ্‌গার। আর আছে বারান্দায় দাঁড়েবসা একটা কুৎসিত কাকাতুয়া। ভগাদার আদরের পাখি। কুকুরটাও আদরের। কাকাতুয়াটাকে ভগাদা আদর করে ডাকত 'কাকু' বলে। আমরা বলতাম "কাড়িয়া পিরেত"। ওদের বাড়ি ঢকলেই কাকাতুয়াটা বলে উঠত, "ভাগো হিঁয়াসে, ভাগো হিঁয়াসে।"

খগাদা আধুনিক কবিতা, পশুপালন, বাজরা-মকাই, তাইচুং ও আই-আর-এইট ধান, ভগাদার ভবিষ্যৎ ইত্যাদি তাবৎ বিষয় নিয়েই আমাদের সঙ্গে জোর আলোচনা করতেন এবং গলার জোর বাড়ানোর জন্যে তেজপাতা-আদা-এলাচ দেওয়া গোরখ্‌পুরী কায়দায় বানানো চা ও ভৈষালোটনের জঙ্গল থেকে আনানো খাঁটি ঘিয়ে ভাজা সেওই খাওয়াতেন।

সেদিন সকালে খগাদার বসবার ঘরে ঢুকতেই দেখি খগাদার মুখ গম্ভীর, থমথমে।

গুনছুঁচ ঢুকে গেছে বুড়ো আঙুলে?

বীরু নিজের বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বলল, "খুব লেগেছে?"

খগাদা বললেন, "লেগেছে, তবে আঙুলে নয়, হৃদয়ে।"

ঢোক গিলে বললাম, "স্ট্রোক! মাইল্ড অ্যাটাক?" খগাদা বললেন, "তার চেয়েও মারাত্মক।"

আমরা বসে পড়ে সমস্বরে বললাম, "কী, তবে কী?"

খগাদা বললেন, "চুরি।"

কোথায়, কোথায়? চোর কোথায়? কী চুরি? বলে আমরা প্রায় চিৎকার করে উঠলাম।

এমন সময় ভগাদাকে দেখা গেল একটা লাল রঙের শর্টস পরে কাবুলী জুতো পায়ে, খালি গায়ে কাকাতুয়াটাকে খাওয়াচ্ছেন নিজে হাতে বারান্দায় এসে।

খগাদা আঙুল দেখিয়ে বললেন, "ঐ যে কালপ্রিট, ঐ দাঁড়িয়ে আছে সশরীরে। সহোদর আমার। সাক্ষাৎ লক্ষ্মণ!

আমাদের খারাপ লাগল, বিশ্বাসও হল না। আপন ভাই কখনও চুরি করতে পারে?

খগাদা কী বলছে বুঝতে না পেরে ভগাদা সাঁ করে বারান্দা ছেড়ে সরে গেল ভিতরে। ধরে-থাকা খাঁচাটা হঠাৎ ছেড়ে দেওয়ায় কাকাতুয়ার খাঁচাটা জোরে নড়ে উঠল। কাকাতুয়াটা বলল, "কাঁচকলা খা! কাঁচকলা খা!" ভগাদাকেই বলল বোধহয়।

খগাদা আস্তে আস্তে বললেন, "গত শনিবার রাতে এ-বাড়িতে যত কাঁসার ও রুপোর বাসন ছিল, সব চুরি করে নিয়ে গেছে চোরে, শুনেছ তোমরা?"

বীরু বলল, "সে কী? বাড়িতে বন্দুক ছিল না?"

আমি বললাম, "অত বড় অ্যালসেশিয়ান কুকুর ছিল!"

"ছেল।" খগাদা বললেন, "ছেল সবই। কিন্তু বন্দুক রাখা ছেল গ্রীজ্‌ মাখানো অবস্থায় বেহালার বাক্সে। আর কুকুর মজাসে ঘুমোচ্ছিল।

আমরা বোকার মতো বললাম, "কুকুর ঘুমোচ্ছিল মানে?"

"তাহলে আর বললুম কী?" খগাদা সখেদে বললেন। তারপর বললেন, "যে বাড়িতে কুকুর ঘুমোয়, সে-বাড়িতে চুরি হবে না?"

এরপর গড়গড়ায় গয়ার তামাকে দুটো টান দিয়ে বললেন, "বুঝলে ভায়ারা, রোজ রাতে পড়াশুনো করি, আর শুনতে পাই বারান্দায় মোহিনীর পায়ের পায়জোড়ের আওয়াজ। মোহিনীকে

ভগা রুপোর পায়জোড় বানিয়ে দিয়েছিল। পা ফেললেই ঝুমুর-ঝুমুর করে বাজে। আওয়াজ শুনতে পাই, কিন্তু এগারোটা বাজলেই দেখি আওয়াজ থেমে যায়। একদিন মনে সন্দ হওয়াতে পা টিপে-টিপে ভগার ঘরের সামনে গিয়ে দেখি ভগা মশারির মধ্যে অঘোরে ঘুমোচ্ছে, আর মেঝেতে শুয়ে মোহিনীও দিব্যি নাক ডাকাচ্ছে। আমি ডাকলুম, 'ভগা।' তাতে 'কে রে' বলেই ভগা উঠে বসে জানালার ধারে আমায় দেখতে পেয়েই ঘুমন্ত মোহিনীর পেটে মারলে ক্যাঁক্ করে এক লাথি। ঘুমঘোরে লাথি খেয়ে মোহিনী তো মারলে বড়ি থ্রো।"—

বীরু বলল, "আর ভগাদা?"

"ভগাদা?" বলে, খগাদা বিদ্রূপের হাসি হাসলেন। বললেন, "ভগা আবার তক্ষুনি শুয়ে পড়ল।"

তারপর বললেন, "তোমরাই বলো, এ-বাড়িতে চুরি হবে না তো কোন্ বাড়িতে হবে?"

আমরা সত্যিই বড় চিন্তায় পড়লাম খগাদার জন্যে। সরি, ভগাদার জন্যে। আসলে ভগাদা মাঝে-মাঝেই আমাদের এবং খগাদাকে ঝামেলায় ফেলতেন।

একদিন কলেজ থেকে বাড়ি ফিরেই শুনলাম খগাদা আমাদের জরুরী তলব দিয়েছেন।

আমরা দৌড়ে গেলাম। দেখি, খগাদার অবস্থা খুব খারাপ। কোলে বার্ট্রান্ড রাসেলের 'কন্‌কোয়েস্ট অব্ হ্যাপিনেস্' বইখানা আধ-খোলা পড়ে আছে, আর খগাদার চোখের কোণে জল চিক্-চিক্ করছে।

বীরু বলল, "খগাদা, কী? দুঃখ কিসের?"

খগাদা বললেন, "আর কী, একমাত্র ভাইটিকে বুঝি হারালাম এবার!"

"কী, হয়েছে কী?" আমি উত্তেজিত হয়ে শুধোলাম।

খগাদা বললেন, "ভগা আর ওর বন্ধু গিদাইয়া পল্মার রাজার বিলে হাঁস মারতে গেছে সেই ভোর চারটেয়—বাড়িতে মশলা বাটতে বলে গেছে। হাঁসের শিক্‌কাবাব বানাবে বলে শিক ঘষামাজা করে রাখতে বলেছে, টক দই, পেঁপে, গরম-মশলা, ভাঙা পিরিচ, সব-কিছুর জোগাড় রেখে গেছে। আর দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতে চলল, এখনও তাদের দেখা নেই। নির্ঘাত কোনো অঘটন ঘটেছে। আমার পায়ের গেঁটে বাতটা বেড়েছে কয়েকদিন হল। আজ আবার অমাবস্যা। রোজ রসুন খাই, তবু ব্যথা যায় না। আমি তো চলচ্ছক্তিরহিত। তোমরা বাবা যাও একটু। আমার জীপগাড়ি-খানা নিয়ে যাও। ভগা গিদাইয়াকে নিয়ে মোটর সাইকেলে করে গেছে।"

বীরু বলল, "নো-প্রবলেম। আপনি চিন্তা করবেন না খগাদা। আমরা বন্দোবস্ত করছি। তার আগে আমি চট করে পোস্ট অফিস থেকে পল্মার রাজবাড়ির ম্যানেজারকে একটা ফোন করে খবর নিয়ে নিই। তাঁকে আমি চিনি, আমার কাকার বন্ধু।"

খগাদা বললেন, "বাস্, বাস্, তাহলে তো কথাই নেই। এই নাও, টাকা নিয়ে যাও।" বলেই, কোমরের গেঁজ থেকে একটা লাল রঙের নাইলনের মোজা বের করে তার থেকে একটা দশটাকার নোট দিলেন বীরুকে।

বীরু বলল, "তুই থাক। খগাদা নিড্‌স কম্পানি।"

খগাদা বললেন, "বুঝলে ভায়া, আজ কত কথাই মনে পড়ছে। ভগা যখন হাসপাতাল থেকে মায়ের সঙ্গে বাড়ি এল, তখন ওকে দেখতে একেবারে বাচ্চা একটা খরগোশের মতো ছিল। কী গাবলু-

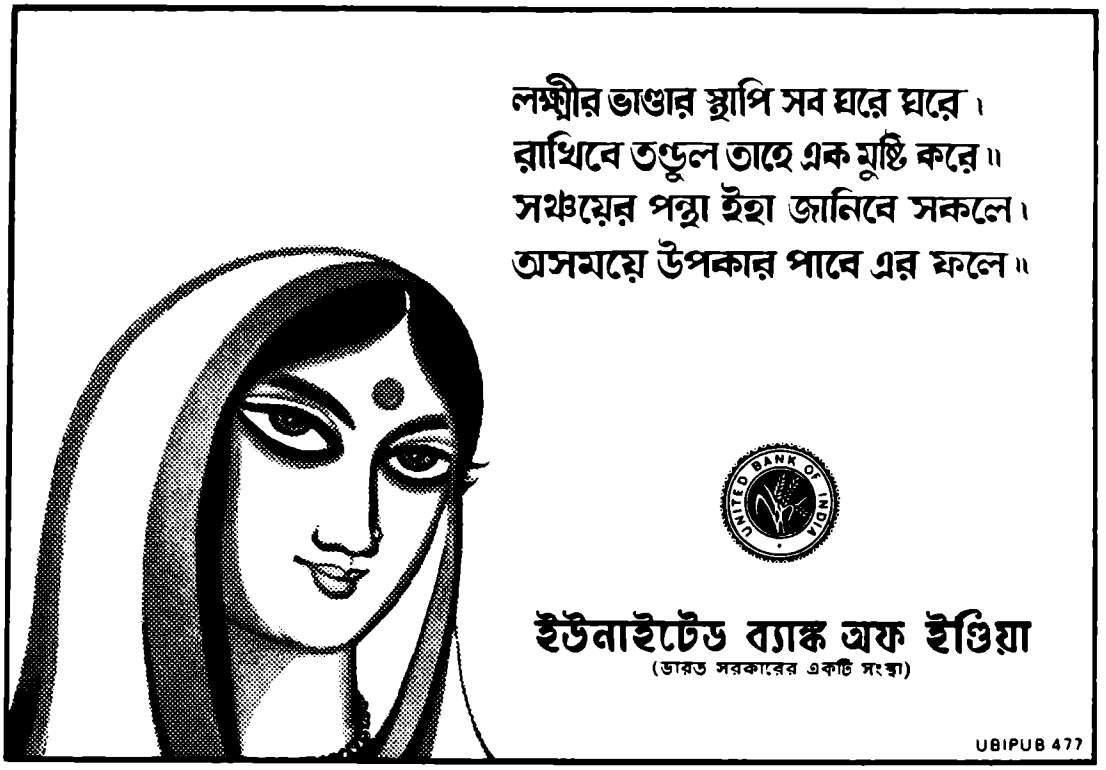

গুবলু। তার উপর আবার খিল খিল করে হাসত। আমার চেয়ে কত ছোট। কিন্তু পড়াশোনা করল না, কিছুই করল না, জীবনটাকে নষ্ট করল পাখি আর কুকুর নিয়ে। আমিই এখন ওর মা, ওর বাবা, ওর দাদা, সব। কী বিপদ হল কে জানে। বিলে কি ডুবে মরল. ন্যা কি সাপে কামড়াল?"

একটু পর ক্রিং ক্রিং করে সাইকেলের ঘণ্টি বাজিয়ে চাকায় কির্-র্-র্ শব্দ তুলে বীরু ফিরল।

খগাদা একবার দাঁড়াবার চেষ্টা করেই মুখ বিকৃতি করে 'উঃ মাগো' বলে পায়ের ব্যথায় বসে পড়লেন।

বসেই বীরুর মুখের দিকে চেয়ে বললেন, "খবর পেলে?"

বীরু অধোবদনে দাঁড়িয়ে গম্ভীর মুখে বলল, "হুঁ।"

"কী?" খগাদা চিৎকার করে উঠলেন। তারপর বললেন "বলে ফেল সোজাসুজি। আছে, না নেই?" তারপরই দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "ভগা রে। আমার ভগাবাবু!"

বীরু বলল, "ভগাদা আছে। কিন্তু রাজার কয়েদখানায়।"

"হোয়াট?" বলে খগাদা আবার উঠে দাঁড়াতে গিয়েই 'গেছি গেছি' বলে বসে পড়লেন।

তারপর হাতের 'কন্‌কোয়েস্ট অব হ্যাপিনেস্'টাকে মাটিতে ছুঁড়ে বললেন, "হোয়াই? হাউ কাম?"

বীরু বলল, "বিলের ধারে রাজার পোষা হাতি চরছিল, ভগাদা তাকে গুলি করেছে।"

"হাতিকে? গুলি? পাখি-মারা ছর্‌রা দিয়ে? ইমপসিবল্! নিশ্চয়ই অ্যাকসিডেণ্ট! তা বলে কয়েদখানায়? খগা সরকারের ভাই কয়েদখানায়?"

বীরু, বীরুর কাকা ও আমি যখন খগাদার জীপ নিয়ে গিয়ে পদ্মার রাজার কয়েদখানা থেকে পঁচিশ টাকা জরিমানা দিয়ে ভগাদা, গিদাইয়া আর মোটর সাইকেলটাকে ছাড়িয়ে আনলাম, তখন রাত হয়ে গেছে।

আসবার পথে বীরু বলল, "ভগাদা, কী করে এমন হল? হাতি কি তোমাকে তেড়ে এসেছিল?"

ভগাদা বললেন, "আরে না না। এই গিদাইয়া ইডিয়টটার জন্যেই তো।"

গিদাইয়া মাথা ঘুরিয়ে টিকি নেড়ে মহা প্রতিবাদ জানাল।

ভগাদা বললেন, "বুঝলি, বিলে এক ঝাঁক পিনটেইল হাঁস ছিল। একটা পুটুস্ ঝোপের পাশে শুয়ে এইম করছিলাম। ভাবছিলাম লাইনে পেলেই একেবারে গদাম করে ঝেড়ে দেব, গোটা ছয়েক উল্টে যাবে। এমন সময়..."

আমি বললাম, "এমন সময় কী?"

ভগাদা বললেন, "এমন সময় গিদাইয়া কানের কাছে ফিসফিস করে বলল, ভগা! ওয়াইল্ড এলিফ্যাণ্ট! তাকিয়ে দেখি, আমাদের পাশেই একটা হাতি দাঁড়িয়ে ভোঁস-ভোঁস করে শুঁড় ঘুরিয়ে নিশ্বাস নিচ্ছে আর কান নাড়াচ্ছে। আমার মন বলল, নিশ্চয়ই পোষা হাতি; রাজার। কিন্তু গিদাইয়া বলল, এক-একটা দাঁত— পাঁচ-পাঁচ হাজার টাকা। অত হাজার টাকার কথা শুনেই আমার মাথা ঘুরে গেল। দিলাম দেগে এক নম্বর ছর্‌রা।"

আমি রুদ্ধশ্বাসে শুধোলাম, "তারপরে কী হল?"

"তারপর আর কী! হাতি বলল, প্যাঁ—অ্যা-অ্যা-অ্যা-অ্যা। আর আমি ও গিদাইয়াও একসঙ্গে ভ্যাঁ—অ্যা-অ্যা-অ্যা-অ্যা।"

বীরু অবাক হয়ে বলল, "কেঁদে ফেললে? এ মা, এত বড় লোক হয়ে কেঁদে ফেললে?"

ভগাদা বলল, "হুঁ হুঁ বাবা, কান্না পেলেও না যদি কাঁদো তবে সঙ্গে সঙ্গে ইস্‌কিমিয়া, মায়াকার্ডিয়াক অ্যাটাক্! হার্ট একেবারে কিমা। জানিস না তোরা কিছুই।"

বীরু বলল, "তারপর?"

"তারপর আর কী? হাতি এসে ঘাড়ে পড়ার আগেই মাহুত আর রাজার পেয়াদা এসে ঘাড়ে পড়ল। বন্দুক কেড়ে নিল। আর কী রুদ্দা, কী রুদ্দা!"

"হাতিটাকে কোথায় মেরেছিলে?" আমি শুধোলাম।

ভগাদা বলল, "এইম করেছিলাম কানের পাশেই নিয়ম-মাফিক।"

গিদাইয়া এতক্ষণ পর কথা বলল। বলল, "কিন্তু কুল্লে চার দানা ছর্‌রা গিয়ে লেগেছিল হাতির সামনের পায়ের গোড়ালিতে।"

ভগাদা চটে উঠে বলল, "য়্যু শাট্ আপ্। দোস্ত তো নয়, সাক্ষাৎ দুশমন্।"

এই ঘটনার কিছুদিন পরই খগাদা আমাদের নেমন্তন্ন করে খুব একচোট খাওয়ালেন। ভগাদা চাকরিতে জয়েন করেছে। অর্ডার সাপ্লাইয়ের ব্যবসা। নিজেই চেষ্টা-চরিত্র করে যোগাড় করেছে। এতদিনে ভাইয়ের একটা গতি হল। সকলেই খুশি, আমরাও। ভগাদা রোজ সময়মত প্যাণ্ট আর হাওয়াইন শার্ট পরে অফিস যায়।

দিন পনরো বাদে খগাদা আবার আমাদের জরুরি তলব দিলেন। গেলাম। বুঝলাম, আবার কেস গড়বড়।

খগাদা বললেন, "আবার একটা উপকার করতে হবে।"

আমরা বললাম, "বলুন কী করতে পারি। ভগাদা কি আবার কোনো ঝামেলা..."

মাশাতাশির মামলা

পবিত্র সরকার

বসে বসে পাশাপাশি,
রেলগাড়ি ঠাসাঠাসি
রাশিরাশি পিসিমাসি—
ভাইপোকে বোন্‌ঝিকে
টাকাকড়ি দিয়ে লিখে
সব চলেছেন হতে
চিরতরে কাশীবাসী।

এ খবরে জাপানের
ওকামুরা মাশাতাশি
চা-পানের অবসরে
করেছিল হাসাহাসি।
ভাইপোরা এল রুখে
দিল তারা কেস ঠুকে,
এখন সে জাপানির
আঁখিজলে ভাসাভাসি।

শোনা গেল, তার নাকি
হয়ে যাবে ফাঁসিটাসি ॥

খগাদা বললেন, "শোনো আগে। চাকরি করছিল ভগা, খুশি ছিলাম কত। কিন্তু গত কয়েকদিন অফিস যাচ্ছিল না। প্রথমে বলছিল পেটে ব্যথা। নাক্স-ভমিকা থারটি দিলাম। তারপর বলতে লাগল গায়ে ব্যথা। আর্নিকা দিলাম। তারপর বলল, রাতে ঘুম হয় না। কালি-ফস্ দিলাম। তাতে ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোবার কথা, কিন্তু সমানে কড়িকাঠের দিকে চেয়ে ভায়া আমার শুয়ে থাকে। কথাও বলে না, খায়ও না। তারপর ওআরস্ট অব অল, কাল থেকে পলাতক। কোথায় যে চলে গেল না বলে-কয়ে!"

বীরু হঠাৎ বলল, "চাকরির ব্যাপারটা একটু খোঁজ করলে হত না? সেখানে কোনো গোলমাল?"

খগাদার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললেন, "ব্রিলিয়ান্ট্। সাধে বলি, তোমাদের মত ছেলে হয় না।"

বীরু আমাকে বলল, "চল, এক্ষুনি ব্যাপারটা জেনে আসা যাক।"

খগাদার কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে বীরু বেরিয়ে পড়ল সাইকেলে আমাকে ডাবল-ক্যারি করে।

সবজিমণ্ডির পাশে মসজিদ, মসজিদের থেকে খানিকটা দূরে কালু মিঞার কাবাবের দোকান, তার পাশে একটা ছোট্ট দোকানঘর —সবুজের উপর সাদায় লেখা সাইনবোর্ড ঝুলছে, ইন্টারন্যাশনাল সাপ্লায়ার্স। কিন্তু সেই আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের কেরোসিন তেলের টিন দিয়ে তৈরি দরজাটাতে একটা মস্ত বড় তালা ঝুলছে।

আমরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম সাইকেল থেকে নেমে।

ইন্টারন্যাশনাল সাপ্লায়ার্সের উল্টোদিকে একটা দর্জির দোকান। খয়েরি আর সাদা খোপ-খোপ লুঙ্গি আর বেগুনে কামিজ পরে মাথায় সাদা টুপি চড়ানো কালো চাপ-দাড়ি-ওয়ালা দর্জি আপনমনে ঝটপট করে পা-মেশিনে রজাইয়ের ওয়াড় সেলাই করে যাচ্ছিল।

আমরা গিয়ে একটু কেসে দাঁড়ালাম।

দর্জি মুখ তুলে নিকেলের ফ্রেমের চশমার কাঁচের ফাঁক দিয়ে চোখ নাচিয়ে বলল, "ফরমাইয়ে।"

বীরু বলল, "খাস কাম কুছ নেহী। এই যে উল্টোদিকের অফিসটা, সেটা বন্ধ কেন? তালা ঝুলছে কেন?"

দর্জি বলল, "দফ্তর বন্ধ হ্যায়। উঠ্ গ্যয়া।"

"উঠে গেছে মানে?" আমরা শুধোলাম।

দর্জি বলল, "জী হাঁ।" তারপর ডান হাতের তিনখানা আঙুল বীরুর নাকের সামনে নেড়ে নেড়ে বলল, "আপিস তো ছিল দুজনের—হেডবাবু গিরধারী পান্ডে আর অ্যাসিস্ট্যান্ট ভগা সরকার। সেদিন কী নিয়ে কথা কাটাকাটি হতে অ্যাসিস্ট্যান্ট গিয়ে হেডবাবুর মাথায় হঠাৎ কাঠের রুলার দিয়ে মারল এক বাড়ি। সাথে সাথ্ মাথা ফট্। হেডবাবু হাসপাতালে আর অ্যাসিস্ট্যান্ট ফেরার। আপিস আর চালাবে কে? কিওয়ারি বন্ধ্।"

আমরা ফিরলাম। খগাদা উদগ্রীব হয়ে বসে ছিলেন। বললেন, "কী খবর?"

বীরু গম্ভীরমুখে বলল, "আপিস উঠে গেছে। হেডবাবু হসপিটালে, অ্যাসিস্ট্যান্ট এবস্কণ্ডিং।"

খগাদা প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে "মার্ডারার, মার্ডারার, কোথায় গেলি, কোথায় গেলি," বলেই দৌড়ে বারান্দার দিকে গেলেন, যেন ভগাদা বারান্দাতেই বসে আছেন।

খগাদা বারান্দাতে গিয়ে পৌঁছতেই ভগাদার ঠোঁটকাটা কাকা তুয়াটা খ্যান্‌খেনে গলায় বলে উঠল, হাইপারটেন্‌শান্। হাইপারটেন্‌শান্!

ছবি/শুভাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য

আচ্ছা বলো তো

ভানুমতী

প্রঃ কান আর সুটকেসের মধ্যে কোথায় মিল?
উঃ দুটোতেই তালা লাগে।

প্রঃ বাঁ পা দিয়ে মারা যায় অথচ ডান পা দিয়ে মারা যায় না কাকে?
উঃ ডান পাকে।

প্রঃ কোন জায়গা কখনো সোজা হয় না?
উঃ উল্টোডাঙা।

প্রঃ একটা লাল জিনিস আছে যা প্রত্যেকদিনই কাগজ খায়, রবিবার ছাড়া। কী সেটা?
উঃ ডাকবাক্স।

প্রঃ কোন পাখিকে দেখলেই মনে হয় চাঁটি লাগাই?
উঃ চড়াই।

প্রঃ কোনখানে নেতারা বাড়ি ভাড়া করে আছেন?
উঃ চাঁইবাসা।

প্রঃ দ্বিতীয় মহাশূর যুদ্ধ কবে হয়েছিল?
উঃ প্রথম মহাশূর যুদ্ধের পরে।

প্রঃ কোন মাঠ দুটো পুকুরের জন্য বিখ্যাত?
উঃ জোড়াদিঘির মাঠ।

প্রঃ বাঘের মাসী কে আমরা সবাই জানি, কিন্তু সিংহের মামা কে?
উঃ ভোম্বল দাস।

প্রঃ লক্ষ্মীর পর সরস্বতী, কার্তিকের পর কে?
উঃ অঘ্রান।

প্রঃ ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কী করে বার করা যায়?
উঃ ক্ষেত্রফলকে দুই দিয়ে গুণ করে দুই দিয়ে ভাগ করে।

প্রঃ ১৭৬১ সালে পানিপথে আফগানদের সঙ্গে মারাঠাদের দেখা হবার পর কী হল?
উঃ পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ হল।

প্রঃ কোন শহরের মাঝখানটা কেটে দিলে শিং গজায়?
উঃ শিলং।

প্রঃ সাতকাণ্ড রামায়ণ শোনার পরও কোন প্রশ্নের উত্তর অজানা থেকে যায়?
উঃ সীতা কার বাবা।

প্রঃ কোন দেশ চামড়ার তৈরি?
উঃ মরক্কো।

প্রঃ ফুলে কখন হাত দিলেই ফোস্কা পড়ার ভয়?
উঃ যখন ফোটে।

প্রঃ কোন ক্যাপটেন নিউজিল্যান্ডে গিয়েছিলেন কিন্তু টেস্ট খেলেননি?
উঃ ক্যাপটেন কুক।

অলৌকিক

বিমল কর

সিনেমা দেখতে গিয়ে বরদা এ-রকম এক ঝঞ্ঝাটে পড়ে যাবে বুঝতে পারেনি। বরং যখন নিউ মার্কেটের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল, তখন তার মেজাজ খুব হালকা। যতরকম বোঝা মাথার ওপর চাপানো ছিল সব নামানো হয়ে গেছে, পরীক্ষা খতম, এ-জন্মের মতন বই মুখস্থ করার পালা শেষ। এ যন্ত্রণা আগেও শেষ হতে পারত, কিন্তু আজকাল যা হয়—গড়িয়ে-গড়িয়ে, এ বছরের পরীক্ষা আসছে বছরেও হবে কি হবে না করতে-করতে পাক্কা দেড় বছর দেরি হয়ে গেল। তবু শেষমেশ যে হয়েছে, আর বরদা তার ল' ফাইন্যাল দিতে পারল এতেই সে খুশী।

মেজাজটা হালকা, বেশ ফুর্তি-ফুর্তি লাগছিল বলে বরদা নবাবী চালে দুটো দামী টিকিট কিনে ফেলল। মানিকের আসার কথা। মানিক আগেই বলে দিয়েছিল, "তুই গিয়ে টিকিটটা কেটে ফেলবি, আমি পৌনে ছটা নাগাদ হাজির হব।"

মানিক বরদার বন্ধু ; দূর সম্পর্কের একটা আত্মীয়তাও রয়েছে। ইলেকট্রিক সাপ্লাইয়ে কাজ করে। বিশাল লম্বা-চওড়া চেহারা, দেখলে মনে হয় না-জানি কত বয়েস, পুলিস-টুলিসে চাকরি করে নিশ্চয়, লালবাজারের কোনো সার্জেন্ট। আসলে ওসব কিছুই নয়, মানিকের চেহারার গড়নটাই যা দৈত্যদৈত্য, স্বভাবে একেবারে ছেলেমানুষ, নরম মন, পকেটমারকেও দু-চারটে চড়চাপড় লাগাতে পারে না।

মানিকই বলে দিয়েছিল "দি ফিয়ার বলে একটা ছবি হচ্ছে। টিকিট কাটবি। ভূতুড়ে ছবি। টেরিফিক ছবি।"

বরদা ভেবেছিল, টিকিট-ফিকিট পাবে না। একেবারে ভুল ধারণা। ভিড় তেমন কিছু নয়। অজস্র টিকিট রয়েছে। তিন হপ্তার মাথায় কত আর ভিড় হতে পারে। হাজার হোক ভূতের ছবি তো!

মানিকের জন্যে অপেক্ষা করতে-করতে বরদা একবার ওজন নিল ওয়েয়িং-মেশিনে। না, ওজন কমেনি। একটা সিগারেট খেল। পোস্টার আর ছবি দেখল সিনেমার। সে ভেবেছিল এডগার অ্যালান পোয়ের কোনো গল্পটল্পর ছবি। তা নয়। অ্যালান পোয়ের গল্প নিয়ে ছবি আগে দেখেছে বরদা। সেই যে একটা ছবিতে কাটা-মুণ্ডু নিয়ে লোফালুফি খেলার দৃশ্য—বিভ্রম বা দুঃস্বপ্ন যাই হোক—সেই দৃশ্যের কথা এখনও মনে আছে বরদার। রীতিমত ভয় হয় দেখলে।

না, মানিকটা এখনও আসছে না। ছটা বেজে গেছে।

বরদা আবার একবার বাইরে এল, রাস্তার কাছে এসে দেখল, মানিকের কোনো পাত্তা নেই। রাস্তায় গিজগিজে ভিড়, হরদম গাড়ি ঢুকছে, নিউ মার্কেটের খদ্দের সব। লাইট হাউসের দিকে এখনও হল্লা, মারপিটের ছবি চলছে।

বরদা ঘড়ি দেখল নিজের। ছটা বারো। কতক্ষণ আর এভাবে অপেক্ষা করা যায়! হল কী মানিকের? অফিসে আটকে গেছে? ওর তো টহল মারার চাকরি। কোথাও গিয়ে ফেঁসে গেছে? আজকাল কলকাতার গাড়িঘোড়ার যা হাল, কোথায় কোন্ জ্যামে আটকে গেছে বলা মুশকিল।

আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা যায়। এখন বিজ্ঞাপন-টিজ্ঞাপন দেখাবে; তারপর ফিল্মস ডিভিশনের ছবি। মনে মনে বিরক্ত এবং অধৈর্যই হয়ে পড়ছিল বরদা। মানিকের হল কী? কোনো ঝামেলায় পড়েনি তো? আপদ-বিপদ?

শেষ পর্যন্ত আর অপেক্ষা করা গেল না।

বরদা কাউন্টারে এসে দাঁড়াল। সসঙ্কোচে বলল, "আমার যদি একটা উপকার করেন?"

কাউন্টারের ওপার থেকে পাকাচুল ভদ্রলোক মুখ তুলে তাকালেন।

বরদা বলল, "আমার এক বন্ধুর আসার কথা ছিল। তার টিকিট কেটেছি। এখনও সে এসে পৌঁছয়নি। আমি তার টিকিটটা আপনার কাছে রেখে যাই। যদি সে আসে, তাকে যদি দয়া করে দিয়ে দেন।"

ভদ্রলোক রাজী হচ্ছিলেন না। নিয়ম নেই। বরদা আবার একটু অনুরোধ করল। বিনয় করেই বলল, "প্লিজ টিকিটটা রেখে দিন।"

রাজী হলেন ভদ্রলোক। বরদা বলল, "আমার বন্ধুর নাম মানিক। আপনাদের কাউন্টার ক্লোজ হবার আগে যদি না আসে —টিকিটটা ছিঁড়ে ফেলে দেবেন।" বলে বরদা ছুটল সিঁড়ি ভাঙতে, লিফ্ট নিল না।

ইন্টারভ্যাল চলছিল। আবার ঘর অন্ধকার হল। গোটা দশেক স্লাইড। পরের ছবির ট্রেলার। তারপর ছবি শুরু হল।

প্রথম থেকেই আঁতকে উঠতে হয়। টাইটেলের মধ্যেই তিন-চারটে মৃত্যু, সবই দুর্ঘটনার মতন, স্বামী-স্ত্রী যাচ্ছে বেড়াতে, হঠাৎ গাড়ি উলটে আগুন ধরে গেল; বিশাল বাড়ির ছাদের কার্নিশে উঠে কাজ করছে একটা লোক, কোমরে প্রোটেকশান বেল্ট, হঠাৎ ঝোড়ো বাতাস এসে লোকটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল। কে একজন জলে সাঁতার কাটছিল —আচমকা তার পা ধরে জলের তলায় কে যেন টেনে নিয়ে যেতে লাগল। জলে ডুবে মরল লোকটা। শেষে দেখা গেল, কোথায় যেন এক প্রাসাদতুল্য বাড়ির বাগান, বাগানের মধ্যে মস্ত কাচের ঘর, নানা ধরনের উদ্ভিদ, লতাপাতা, ফুল। কাচের ঘরে বসে একটি মেয়ে ছবি আঁকছে, হঠাৎ কোথাও কিছু নেই; মাথার ওপরকার কাচের চাল ভেঙে পড়ল ঝনঝন করে। তারপর দেখা গেল, কেমন কিম্ভূত এক ছায়া যেন মাঠঘাট রাস্তার ওপর দিয়ে উড়ন্ত ধুলোর ঝাপটার মতন দূরে পালিয়ে যাচ্ছে।

বরদা রীতিমত ডুবে গিয়েছিল ভৌতিক ক্রিয়াকলাপে। রোমাঞ্চ অনুভব করতে শুরু করেছিল। হঠাৎ অন্ধকারে নজরে পড়ল, তার পাশের সিটে কে যেন এসে বসেছে।

ওরা তো আপনারই মুখ চেয়ে আছে

ছেলেমেয়ে যখন ছোট তখন থেকেই তাদের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সব বাবা-মাই চান। তাদের জন্য পদে পদে বাবা-মার কতনা স্নেহ, যত্ন, উৎকণ্ঠা। আদর-যত্নে ছেলে-মেয়ে মানুষ করাই কিন্তু শেষ কথা নয়। তার চেয়ে বড় কাজ তাদের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলা আর সে দায়িত্ব আপনাদেরই। মেয়ের বিয়ে বা ছেলের উচ্চশিক্ষার জন্য প্রয়োজন টাকার। সেই টাকা আজ থেকেই আপনাকে সঞ্চয় করতে হবে। তবেই তো আপনার দায়-দায়িত্ব পালন করতে পারবেন।

এর জন্য একটি চমৎকার সঞ্চয়-পরিকল্পনা আমাদের আছে। ৫০০০৲ ক্যাশ সার্টিফিকেট কিনলে ২৫ বছর পর আপনি পাবেন ৬০,২৮৫.৬০৲। এর চেয়ে ভালো সঞ্চয়-ব্যবস্থা আর কি হতে পারে?

নিজেকে বারবার জিজ্ঞাসা করুন, "ছেলেমেয়ের ভবিষ্যতের জন্য যতটা দরকার সবকিছু কি আমি করেছি?"

পূর্ণ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন:

ইউনাইটেড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস: ৭, রেড ক্রস প্লেস
কলিকাতা-৭০০০০১ ● টেলিফোন: ২৩-৯৭৮৪ (৩টি লাইন)
॥ অথবা আমাদের যে কোন শাখা অফিস ॥

Progressive/UIB-15/75

মানিক?

মানিক মনে করে বরদা কিছু বলতে যাচ্ছিল, থেমে গেল হঠাৎ। না, মানিক নয়। মানিকের ধারে-কাছেও যায় না লোকটা। দশাসই চেহারা মানিকের, এর চেহারা বেঁটেখাটো, রোগা-রোগা। অন্ধকারে কিছুই তো বোঝা যায় না। তবু আলো যখন খানিকটা স্পষ্ট হচ্ছে বরদা পাশের লোকটিকে লক্ষ করছিল। লোকটা এই সিটে এসে বসল কেন? এটা তো মানিকের সিট। বরদা টিকিট কেটেছে। তাহলে কি টিকিটটা কাউন্টার থেকে সেই ভদ্রলোক বেচে দিলেন নাকি? পয়সাটা পকেটে পুরলেন? কাণ্ড দেখেছ?

বরদা ছবি দেখতে লাগল। সামান্য মন খুঁতখুঁত করলেও কিছু বলা যাচ্ছে না লোকটাকে। সে যদি বলে, আমি টিকিট কিনে এসেছি, তাহলে বরদা কী বলবে! বা এমনও হতে পারে, বরদার বাঁ দিকের সিটটা মানিকের। ডান দিকের সিটের নম্বর ওরই। বরদা তো সিটের নম্বর দেখে বসেনি, নম্বরটাও জানে না। আটটা সিট ছেড়ে বসতে বলেছিল, টর্চ দিয়ে সিট দেখিয়ে দিয়েছিল হাউসের লোক, বরদা যথারীতি এসে ঝপ করে বসে গেছে।

বরদারই ভুল হয়ত। ছবি দেখতে লাগল একমনে।

বেশ জমে উঠেছে ছবিটা। ব্রিলিয়ান্ট ফটোগ্রাফি। সেইরকম ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক। সত্যিই রহস্য ধরিয়ে দিচ্ছে।

আড়চোখে লোকটার দিকে তাকাতেই বরদা দেখল, লোকটা এবারে একেবারে সিটের মধ্যে ডুবে গেছে। মানে, তার ঘাড় পিঠ সব নরম সিটের মধ্যে ডোবানো, মাথাও যেন দেখা যাচ্ছে না, বরং মাথাটা বুকের দিকে হেলে পড়েছে।

লোকটা হলে ঢুকে ঘুমোতে শুরু করল নাকি?

বরদা বিরক্ত বোধ করল। তার পাশের সিটে বসে একটা লোক ঘুমোবে—এ তার বরদাস্ত হচ্ছিল না। লোকটা হয়ত বরদারই পয়সায় কেনা টিকিট কাউন্টার থেকে হাতিয়ে এনে হলে ঢুকে ঘুমোচ্ছে! বাড়িতে কি ঘুমোবার জায়গা নেই? আশ্চর্য!

মুখ ফিরিয়ে বরদা আবার ছবি দেখায় মন দিল। পুরনো কোনো বাড়ি, দুর্গের মতন দেখতে, বিশাল বিশাল ঘর, বিচিত্র সব আসবাব, অজস্র রকমের অস্ত্র, কোনো কিছুরই অভাব নেই, অভাব শুধু মানুষের। একটিও লোক নেই, একেবারে জনহীন পুরী। এইভাবে ঘর থেকে ঘর যেন ঘুরে বেড়াবার পর এক-জনকে দেখা গেল। চুপসোনো বেলুনের মতন মুখ, বিশাল লম্বা নাক, গর্তে ঢাকা চোখ। একটা বড় কফিনের পাশে বসে আছে লোকটা। কফিনের ওপর অজস্র কারুকার্য।

বরদা আবার একবার চোখ ফেরাল। পাশের সিটের লোকটা একই ভাবে চেয়ারের মধ্যে ডুবে ঘুমোচ্ছে। আশ্চর্য! আরও তো অনেক সিট ফাঁকা পড়ে আছে, বরদার ডান দিকে গোটা পাঁচেক, বাঁ দিকে কম করেও সাত-আটটা। হতভাগা মরতে তার পাশে এসে জুটল কেন? অন্য কোনো ফাঁকা সিটে গিয়ে ঘুম মারলেই তো পারত।

মানিকের ওপরই রাগ হচ্ছিল বরদার। মানিকের জন্যেই এই অবস্থা!

যাক গে, মরুক গে! বরদা আবার ছবিতে মন দিল।

ছবি শেষ হয়ে এল। লোকজন উঠে দাঁড়াতে শুরু করেছে। বরদা একবার পাশের লোকটার দিকে তাকাল। অবিকল একই ভাবে ঘুমোচ্ছে।

বেশ খানিকটা ঠাট্টা ও বিরক্তির সঙ্গে বরদা বলল, "ও মশাই, উঠুন। অনেক ঘুমিয়েছেন।"

কোনো সাড়া-শব্দ নেই।

বরদা এবার লোকটার কাঁধে ঠেলা মারল আস্তে করে। কোনো ফল হল না।

ততক্ষণে ছবি শেষ। বাতি জ্বলে উঠেছে।

বরদা আলোয় একবার লোকটার দিকে তাকাল। তারপর উঠে দাঁড়াল। এ-রকম বিচিত্র মানুষ সে জীবনেও দেখেনি।

চলে যাবার সময় বরদা আবার একবার ঝুঁকে পড়ে বলল, "এই যে স্যার, উঠুন, ছবি শেষ হয়ে গেছে।"

বলতে বলতে আচমকা বরদার নজরে পড়ল, লোকটার গলার কাছে জামার বোতাম খোলা, গেঞ্জিতে কিসের যেন দাগ ঘন হয়ে রয়েছে। অনেকটা দাগ। প্রায় বুক জুড়ে। রক্তের মতন মনে হচ্ছে। জামাটারও বুকের কাছে সেই দাগ ছড়িয়ে পড়েছে।

বরদার সমস্ত শরীর নিমেষের মধ্যে ঠাণ্ডা বরফ হয়ে গেল। পা কাঁপতে লাগল থরথর করে, মুখ একেবারে ছাই, গলা শুকিয়ে কাঠ। বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডটা যেন লাফাচ্ছিল। লাফাতে-লাফাতে গলার কাছে উঠে আসছিল।

প্রায় চিৎকার করে উঠতে যাচ্ছিল বরদা। গলা বন্ধ হয়ে গেল। লোকজন সব চলে যাচ্ছে। কী করবে সে? চেঁচাবে? লোক ডাকবে? তার পাশের সিটে বসে একটা লোক মরে গেল, সে বুঝল না! নাকি এখনও বেঁচে আছে লোকটা? কেমন করে মরল? স্ট্রোক? হার্টফেল? খুন? রক্ত এল কোথা থেকে? কে তাকে খুন করবে এই হলের মধ্যে। বরদার পাশেই লোকটা বসে ছিল। একটা শব্দও করেনি।

ভয়ে আতঙ্কে এমন হল বরদার যে, সে আর লোকটার দিকে তাকাতে পারল না। বরং তার মনে হল, এই মুহূর্তে তার পালিয়ে যাওয়া উচিত। যদি না যায়, তো সে নানারকম ঝঞ্ঝাটে জড়িয়ে পড়বে। থানা, পুলিস, আরও কত রকম ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে পারে!

বরদা যেন বেহুঁশের মতন তাড়াতাড়ি এগুতে লাগল। এখনও প্যাসেজ দিয়ে লোক যাচ্ছে। ভিড় সামান্য কমেছে। দু-একজন বরদার দিকে তাকাল। হয়ত লোকটার দিকেও। ওই একটিমাত্র লোক, যে এখনও বসে আছে। চোখে পড়ারই কথা। কে আর কবে সিনেমা শেষ হয়ে যাবার পর চেয়ারে বসে-বসে ঘুমোয়।

নিজেকে অন্যের নজর থেকে বাঁচাবার জন্যে বরদা মুখ নিচু করে ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল, মিশে গিয়ে এর-ওর পাশ দিয়ে ঠেলাঠেলি করে তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে যাবার জন্যে ছুটল। পালাতে লাগল।

সিঁড়ি ভেঙে নীচে নামার সময় বরদা বেশ বুঝতে পারল—তার পা কাঁপছে, মাথা টলছে, দম বন্ধ হয়ে আসছে। হয়ত সে নিজেই এবার হার্টফেল করবে। হায় ভগবান!

একেবারে নীচে লবিতে নেমে এল বরদা। কোনো খেয়াল নেই। সে পালিয়ে যাচ্ছে। না পালিয়ে তার উপায় নেই।

"বরদা?"

বরদা কিছুই শুনল না। কাচের দরজার বাইরে সিঁড়িতে এসে দাঁড়াল। সামনে রাস্তা।

"এই বরদা!"

বরদার তখনও হুঁশ নেই।

"কী রে? কালা হয়ে গিয়েছিস নাকি?"

বরদা তাকাল। একেবারে থতমত চোখ। যেন চিনতে পারছে না। বুঝতে পারছে না, কে ডাকছে।

বরদার কাঁধে হাত পড়তেই চমকে উঠল সে। তাকাল। বিহ্বল দৃষ্টি। "মানিক?"

"ব্যাপার কী রে? কখন থেকে তোকে ডাকছি।"

"তুই?" বরদা ঢোঁক গিলল। গলা কাঠ। ঠোঁট চাটল, জিব শুকনো। তারপর মানিকের হাত ধরে ফেলল খপ্ করে। কথা বলতে পারল না। ঠোঁট কাঁপতে লাগল থরথর করে।

মানিক অবাক। হল কী বরদার?

প্রায় কেঁদে ফেলল বরদা। "মানিক, সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে।"

"সর্বনাশ? কিসের সর্বনাশ?"

লোকের ঠেলা খেয়ে গাড়ি-বারান্দার মতন জায়গাটায় দাঁড়াল দুজনে।

বরদা ভীত গলায় বলল, "আমার সিটের পাশে একটা লোক বসে ছিল। মারা গিয়েছে।"

"মারা গিয়েছে?"

"বোধ হয় খুন। রক্ত রয়েছে বুকের কাছে। চাপ চাপ। সমস্ত জামাটা ভিজে গেছে।"

মানিক হাঁ করে বন্ধুর মুখ দেখতে লাগল। পাগল হয়ে গিয়েছে নাকি বরদা? ভূতের ছবি দেখতে এসে ওর ঘাড়ে ভূত ভর করল? মানিক বলল, "কী পাগলের মতন কথা বলছিস? সিনেমা হলে কেউ খুন হয়?"

"হয়েছে," বরদা বলল, "হয় খুন, না হয় স্ট্রোক।"

"তোর মাথা হয়েছে।"

"লোকটা এখনও চেয়ারের মধ্যে পড়ে আছে।"

"অসম্ভব। কেউ মারা গেলে চেয়ারে বসে থাকতে পারে না। গড়িয়ে পড়ে যাবে।"

"আমি তাকে বসে থাকতে দেখেছি।"

সুলেখা কলার বক্সের রং দিয়ে ছবিটি রাঙিয়ে তোল

"তুই খেপামি করছিস।"

বরদা প্রাণপণে মানিকের হাত চেপে ধরে ঝাঁকুনি দিল। "তুই বিশ্বাস কর।"

মানিক বিশ্বাস করতে চাইল না। একটু ভাবল। "চল্, গিয়ে দেখি।"

চমকে উঠল বরদা। "দেখবি? না না।"

"বাঃ, দেখব না-! সত্যি যদি কোনো লোক হলের মধ্যে মারা গিয়ে থাকে—ম্যানেজারকে বলতে হবে।"

বরদা কাঠের মতন শক্ত হয়ে গেল। "না, চল্, আমরা পালিয়ে যাই।"

মানিক বন্ধুর মাথা সম্পর্কে সন্দেহ করতে লাগল। বলল, "তোর সত্যিই মাথা খারাপ হয়ে গেছে। —একটা লোক সিনেমা দেখতে এসে হঠাৎ হার্টফেল করতে পারে, স্ট্রোকও হতে পারে। যদি তাই হয়ে থাকে, ম্যানেজারকে জানানো উচিত।"

হঠাৎ যেন কী খেয়াল হল বরদার। বন্ধুর মুখের দিকে তাকাল। "তুই কখন এসেছিস? আমি কাউন্টারে তোর জন্যে টিকিট রেখে গিয়েছিলাম। হঠাৎ দেখি তোর বদলে অন্য একটা লোক এসে পাশে বসল। বসেই ঘুমোতে শুরু করল। তারপর কখন মারা গেছে।"

মানিক জিভের শব্দ করল যেন বরদার পাগলামি আর তার সহ্য হচ্ছে না। বলল, "আমার আসতে বেশ দেরি হয়ে গিয়েছিল। তুই যে হলে ঢুকে যাবি, তা জানতাম। আমি যখন এলাম, কারেন্ট কাউন্টার ক্লোজ করে দিচ্ছে। একটা টিকিট চাইলাম। দিতে চাইল না, বলল শো শুরু হয়ে গেছে। আমিও নাছোড়-বান্দা। শেষে একটা টিকিট দিল। বলল, "একজন তার বন্ধুর জন্যে রেখে গেছে। তোমার পাশেই তার সিট নাম্বার। পয়সাটা তাকে দিয়ে দিও।"

বরদা বোবা হয়ে গেল। "তাহলে তো আমার রেখে আসা টিকিট।"

মানিক পকেট হাতড়ে টিকিটটা বার করতে লাগল।

"আমি তোর নাম বলে এসেছিলাম।"

"আমায় নাম জিজ্ঞেস করেনি।" পকেট থেকে টিকিটের ছেঁড়া টুকরোটা বার করল মানিক। "তোর টিকিটটা বার কর।"

বরদা পকেটে হাত দিল। হাত তখনও ঠাণ্ডা। ছেঁড়া টুকরোটা পাওয়া গেল।

মানিক নম্বর মেলাল। বলল, "একই রো, পাশাপাশি নম্বর। যাব্বাবা, তা হলে তুই এক জায়গায় আর আমি অন্য জায়গায় বসলাম কেমন করে?"

বরদাও কিছু বুঝতে পারছিল না। এ কেমন করে হয়? একই রো, পাশাপাশি নম্বর, তবু দুজনে দু জায়গায় কেমন করে বসল! নিশ্চয় কাছাকাছি বসেনি। বসলে মানিক অন্ধকারেও তাকে খুঁজতে পারত। সিনেমা ভেঙে যাবার পরেও হলের মধ্যে মানিক তাকে দেখতে পেত।

বরদা কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল, "তুই কোথায় বসেছিলি?

"একেবারে সাইড্ ঘেঁষে পেছন দিকে।"

"আমারটা সামনে ছিল। আশ্চর্য!"

"আমার পাশে দুজন অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ছেলেমেয়ে ছিল," মানিক বলল, "আমি ছেলেটাকে টিকিটের কথা জিজ্ঞেসও করেছিলাম। সে বলল, কোনো একস্ট্রা টিকিট কাউণ্টারে সে রেখে আসেনি।...তোর কথাও আমার মনে হয়েছিল। তোকে দেখতেই পেলাম না হলে।"

"তা হলে?"

মানিক নিজেও এবার ধাঁধায় পড়ে গেল। ভাবছিল। তারপর বলল, "ভুল করেছে। সিট দেখাবার সময় লোকটা ভুল করেছে। রো পড়তে ভুল করেছে। নয়ত এ-রকম হতে পারে না।"

বরদা চুপ। তার মুখে কথা আসছিল না।

মানিক হঠাৎ বলল, "তুই তা হলে একটু দাঁড়া। আমি খোঁজ নিয়ে আসি।"

"কিসের খোঁজ?"

"নাইট শো শুরু হয়ে আসার সময় হচ্ছে। হলের মধ্যে যদি সত্যিই কেউ মরে পড়ে থাকে, গেটকিপার এতক্ষণে নিশ্চয় জানতে পারবে।...তুই দাঁড়া, আমি আসছি।"

বরদা বাধা দিতে গেল। বারণ করল। কিন্তু মানিক তার আগেই কাচের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে গেছে।

কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল বরদা। তার মনে হচ্ছিল, পালিয়ে যায়। মানিক আরও ঝামেলা পাকাল। বিপদে পড়তে হবে। মরা লোকটাকে এতক্ষণে নিশ্চয় পাওয়া গেছে। ওপরতলায় হইচই লেগে গেছে বোধ হয়। থানায় ফোন করছে ম্যানেজার।

বরদা আর দাঁড়াতে সাহস করল না। রাস্তার দিকে গেল। হাতের ছেঁড়া টুকরোটা ফেলে দিতেই যাচ্ছিল, কী খেয়াল হওয়ায় আবার একবার নম্বরটা দেখল। এটা ফেলে দিলেই হয়। বরদা সিনেমায় এসেছিল তার প্রমাণ কী? না, সে আসেনি। কে মারা গেছে না-গেছে সে জানে না।

টিকিটটা ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে মুখ ওঠাতেই বরদার হঠাৎ নজরে পড়ল, তার প্রায় চোখের সামনে দিয়ে ওপাশের ফুটপাথ দিয়ে সেই লোকটা হেঁটে যাচ্ছে। অবিকল সেই লোক। বেঁটে, রোগা রোগা। মুখ নিচু করে আপন মনে চলে যাচ্ছে।

বরদা একেবারে থ'। মরা মানুষ আবার জ্যান্ত হয়ে উঠল নাকি? চোখের ভুল? ভৌতিক ব্যাপার?

মানিক ততক্ষণে আবার ফিরে এসেছে। বেশ খেপে গিয়েছে যেন। বলল, "তুই পাগল হয়েছিস। নির্ঘাত পাগল হয়েছিস। হলে কেউ মারা যায়নি। কেউ নেই। গেটকিপার নাইট শোয়ের লোক ঢোকাচ্ছে।"

বরদা আঙুল দিয়ে লোকটাকে দেখাল। "ওই যে ওই লোকটা।"

মানিক প্রথমে থতমত খেয়ে গেল। তারপর বরদাকে টান মেরে ছুটতে লাগল। লোকটাকে ধরতে।

ততক্ষণে শরবতের দোকান পেরিয়ে ডান দিকে বেঁকে গিয়েছে লোকটা। চোখের আড়ালে চলে যাচ্ছে।

মানিক ছুটতে-ছুটতে বলল, "তুই ঠিক দেখেছিস?"

"ওই রকমই দেখতে।"

"চল্, দেখি।"

লোকটা চৌরঙ্গির রাস্তা পেরোচ্ছিল। কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। দু পাশ দিয়ে গাড়ি যাচ্ছে। এভাবে কেউ রাস্তা পেরোয় না এখানে। যে কোনো সময় চাপা পড়তে পারে লোকটা।

মানিকরা দাঁড়িয়ে পড়ল।

লোকটা ওপারে চলে গেছে।

রাস্তা ফাঁকা হতেই মানিকরা আবার ছুটল।

ট্রাম লাইনের গায়ে গায়ে এসে দাঁড়াল লোকটা। তাকাল। যেন দেখল ট্রাম আসছে কিনা!

বরদা আর মানিক ততক্ষণে বেশ কাছাকাছি এসে পড়েছে।

লোকটা হঠাৎ পেছন দিকে তাকাল। বরদা আর মানিককে দেখতে পেল।

কোথাও কিছু নেই, তবু সেই অদ্ভুত মানুষটা হাসতে লাগল। বিকট হাসি নয়, কেমন যেন মজার হাসি, আমোদ পাবার হাসি।

বরদা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। মানিকও। (ক্রমশ)

ছবি/মদন সরকার

কালোদার গল্প

সুব্রত সেনগুপ্ত

কালোদা যখন আমাদের বাড়িতে কাজ করতে আসে, আমরা তখন কুলটিতে থাকতাম। কালোদা দেখতে কীরকম বলছি। তার গায়ের রঙ আর মাথার চুলের মধ্যে কোনটা বেশি কালো বলা ভারি মুশকিল। চেহারায় বেশ লম্বা আর রোগা। মুখে কখনও হাসি দেখেছি, মনে পড়ে না। শীত কি গরম সব সময় তার গায়ে একটা হাফহাতা গেঞ্জি, পরনে খাকি হাফপ্যান্ট। সম্পত্তি বলতে ছোট্ট একটা ফুল আঁকা টিনের বাক্স। তাতে ছুরি, সেফটিপিন থেকে রাজ্যের সব জিনিস আছে। আর একটা গুলতি। গুলতিতে কালোদা রোজ যত্ন করে তেল মাখাত। কাউকে ছুঁতে দিত না। আমাদের বাড়িতে যার যত জরুরি কাজ তার তত কালোদাকে দরকার। মেজকাকুর জরুরি কাগজপত্র আসানসোলে উকিল বাবুর কাছে দিয়ে আসতে হবে—কালোকে ডাকো। ফুলদি, রাঙাদিরা ম্যাটিনিতে সিনেমা দেখতে যাবে, তার জন্য টিকিট চাই। কিন্তু বাবা বা কোনো কাকু যেন জানতে না পারে, কালোদাকে চাই। কালোদা একদিন বাজারে না গেলে মা-পিসিমার মেজাজ খারাপ হয়ে যাবে। সারাদিন ধরে বাজারের খুঁত বেরোবে। পিসিমার পুজোর ফুল আনা হয়েছে—বেলপাতা কম পড়েছে। এমন মাছ এসেছে যে, কাঁটার জন্যে মুখে নেওয়া যাচ্ছে না। এ মা, সজনে ডাঁটা এনেছে, তার সঙ্গে মিষ্টি কুমড়ো আনেনি, এই রকম। আমি আমার কলমটা খুঁজে পাচ্ছি না। কিন্তু নির্মলবাবু স্যারের দেওয়া হোম টাস্ক এখনও বাকি। ফুলদিকে গিয়ে যদি বলি, তোমার কলমটা একটু দাও, ফুলদি অমনি জোরে জোরে বলতে থাকবে, সেদিন নতুন কলম কিনে দেওয়া হল, এর মধ্যে হারিয়ে ফেলেছিস! দাঁড়া। বাড়ির কারও জানতে বাকি থাকবে না। ইস, তোমার যেন আর কিছু হারায় না। সেদিন তোমার ঘড়ি হারিয়ে মুখ কালো করে বাড়ি ফেরনি? ফুলদিকে বলা যাবে না। কিন্তু কলমের কথা কালোদাকে বললে তার টিনের বাক্স থেকে মাথা-মোটা একটা কলম বের করে দেবে। আর কেউ তা জানতে পারবে না। কালোদাকে আমরা কোনদিন কাঁদতেও দেখিনি। শুধু দুপুরের দিকে তাকে মাঝে-মাঝে দেখা যেত আমাদের বাড়ির পেছন দিকে গাছের নীচে চুপচাপ বসে আছে। বুধু বলত, ওই সময় মেদিনীপুরের মা-বাবার জন্য কালোদার মন খারাপ লাগে।

কালোদার সঙ্গে আমরা একদিন আসানসোলে বেড়াতে গিয়েছিলাম। আমরা মানে বুধু, পল্টু আর আমি। কুলটির চাইতে আসানসোল অনেক বড় জায়গা। কত ঘর বাড়ি, দোকান বাজার। পল্টু জিজ্ঞেস করল, হোটেলে খাবি? আমারও অনেক-দিন থেকে হোটেলে খাওয়ার ইচ্ছে। কাঁচের বাক্সে ওরা কত কী রান্নাকরা ডিম, আলুর দম সাজিয়ে রাখে। দেখলেই খেতে ইচ্ছে করে। কিন্তু বাবাদের সঙ্গে বেরলে ও সব ছোঁয়ার জো নেই। কালোদাকে জিজ্ঞেস করলাম, কালোদা, আমরা এই হোটেলে খাব? ও প্রথমে রাজী হল না। বলল, বাবুরা শুনলে রাগ করবে। তারপর কী ভেবে বলল, আচ্ছা চলো। বাজারের কাছে একটা ভালো হোটেল আছে। আহ্, কলাপাতায় ভাত, মাটির গ্লাসে জল! আলাদা প্লেটে লেবু আর চাটনি। শুধু ডাল আর ছ্যাচড়া দিয়ে খেতেই যে কী ভাল লাগল। বাড়িতে অনেক ভাল ভাল জিনিসেও এত স্বাদ পাওয়া যায় না। বুধু দুবার চাটনি চেয়ে নিল। খাওয়া শেষ হলে আমরা বাজারে ঘুরতে লাগলাম। কত রকম জিনিস। কালোদা কী কী কেনাকাটা করল। এক জায়গায় গিয়ে দেখি, বন্দুকের টিপ পরীক্ষা হচ্ছে। একটা বোর্ডে কতগুলো বেলুন আটকানো আছে। একটা খেলনা-বন্দুক থেকে গুলি ছুঁড়ে বেলুন ফাটাতে হবে। একটা ফাটাতে পারলে আর একবার এমনি বন্দুক ছুঁড়তে দেওয়া হবে। পল্টু বলল, উইলিয়াম

টেলের নাম শুনেছিস? উইলিয়াম টেলের তীর-ধনুককে দারুণ টিপ ছিল। বাঃ, শুনব না কেন? আমাদের গ্রীন রিডারেই তো উইলিয়াম টেলের গল্প আছে। হাফইয়ারলি পরীক্ষার আগেই আমাদের ওটা পড়ানো হয়ে গেছে। বুধু গম্ভীরভাবে বলল, ভেংকুভেলের নাম শুনেছিস? পল্টু শোনেনি। আমিও না। বুধু নিশ্চয় বানিয়ে বলছে। ও এরকম সব বানিয়ে বলবে। একদিন বলেছিল, তোরা তো ফুটবল প্লেয়ার পেলের নাম শুনেছিস। আচ্ছা বল তো আয়োডেক্স কোন টিমে খেলে? কে না জানে আয়োডেক্স কোনো টিমেই খেলে না। খেলার পর অনেককে পায়ে আয়োডেক্স মালিশ করতে হয়। কথা বলতে বলতে আমরা একটু এগিয়ে গিয়েছিলাম। পল্টু হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, কালোদা কোথায় রে? পেছন ফিরে দেখি কালোদার সঙ্গে সেই টিপ পরীক্ষা-ওলার কী নিয়ে তর্ক হচ্ছে। বেশ কিছু লোক জুটে গেছে। কী ব্যাপার? সামনে গিয়ে শুনি, কালোদা টিপ পরীক্ষার জন্য যে পয়সা দিতে হয়, দিয়ে বন্দুক নিয়েছিল। তারপর পরপর গুলি ছুঁড়ে লোকটার অর্ধেকের বেশি বেলুন ফাটিয়ে দিয়েছে। বেলুনওয়ালা বলছে, আমার বন্দুক ফেরত দাও। তোমাকে আর টিপ দেখাতে হবে না। আর কালোদা বলছে, নিয়ম মতো তাকে আবার বন্দুক ছুঁড়তে দিতে হবে। কালোদা ঠিকই বলেছে। কিন্তু লোকটা কিছুতেই দেবে না। কালোদাও ছাড়বে না। যেসব লোক জড়ো হয়েছিল তাদের কেউ কালোদার পক্ষে, আবার কেউ বেলুনওয়ালার। আমরা চাইছিলাম, কালোদা আমাদের চোখের সামনে বাকি সব কটা বেলুন ফাটিয়ে দিক। সেই সময় মেজকাকুর উকিলবাবু কোত্থেকে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি সব শুনে কালোদাকে বুঝিয়ে বলতে লাগলেন, আরে বাপু, তোমার হাতে টিপ আছে, সে তো সবাই দেখেছে। বুঝছ না কেন তুমি বাকি সব বেলুন ফাটালে এ বেচারার ব্যবসা লাটে উঠবে।

কালোদা ওদের আর কিছু বলল না। শুধু আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল, বাড়ি চলো। বাড়ি ফিরতে ফিরতে আমরা বলাবলি করতে লাগলাম, উকিলবাবুর কাজটা ঠিক হয়নি। তাঁর উচিত ছিল, বেলুনওয়ালাকে বোঝানো। তার বেলুন ফাটিয়ে কালোদা ঠিকই করেছে। ও কেন টিপ পরীক্ষা করতে এসেছিল? কিছুক্ষণ পর পল্টু বলল, উকিলবাবু যদি মেজকাকুকে সব বলে দেয়? তাই হল। আমাদের হোটেলে খাওয়ার কথাটাও চাপা থাকল না। বুধুটা কখন বোকার মতো ফুলদিকে সব বলে ফেলেছিল। আর কোনদিন যা হয়নি তাই হল। মেজকা, বাবা, পিসিমা সবাই মিলে কালোদাকে যা নয় তাই বলতে লাগলেন। আমরা ভাবলাম, কালোদা এবার রাগ করে দেশে চলে যাবে। কিন্তু কিছুই হল না। কালোদা একটা কথাও বলল না। সব আবার আগের মতো চলতে লাগল।

একবার কালোদার অসুখ হল। সাত আট দিনেও সারে না। বাবা জিজ্ঞেস করলেন, কালো, বাড়ি যাবি? কালোদা বলল, না। সবাই বলতে লাগল, আমাদের যেমন কালোদার ওপর, কালোদারও তেমনি আমাদের ওপর মায়া পড়ে গেছে, ও আর-পাঁচজনের মতো আমাদের বাড়িরই কেউ। কালোদা যে বাইরে থেকে এসেছে, অন্য জায়গায় তার মা বাবা আছে, সবাই তা প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। এর কিছুদিন পর রাঙাদি আর পিসিমা বেনারস যাবে। সঙ্গে ছোড়দার যাওয়ার কথা। কিন্তু ছোড়দা যেতে পারল না। বাবা বললেন, কালো যাক। আমাদের বাড়িতে আসার পর কালোদার সেই প্রথম বাইরে যাওয়া। আমরাও অ্যানুয়াল পরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। পিসিমারা যখন ফিরলেন আমাদের পরীক্ষা-টরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে।

কয়েকদিন পর বেশ শীত পড়েছে। রবিবার। দুপুরেও আমরা চাদর মুড়ি দিয়ে ক্যারাম খেলছি। ফুলদি হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বলল, কালোদা একটা কাক মেরে ফেলেছে। ফুলদির কথা শেষ হতে না হতে পিসিমা প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন, কী সর্বনাশ! কাক মারলে অকল্যাণ হয়। পিসীমাকে শান্ত করে বাবা জিজ্ঞেস করলেন, কেন মারল কালো? কী হয়েছিল? ফুলদি বলল, কালোদা গুলতি ছুঁড়ে কাকটা মেরেছে। আমারও মনে হতে লাগল, কালোদা এ কাজটা ঠিক করেনি। কালোদা কেন একটা কাক মারতে গেল? আমি শুনেছি, কাক মরে ভূত হয়ে যায়। বাবা বললেন, ডাক তো কালোকে। ফুলদি কালোদাকে ডাকতে ছুটে গেল, কিন্তু একটু পরেই ফিরে এসে বলল, এই তো বাগানে ছিল। এখন নেই। কালোদা কোথায় গেল? কিন্তু তাকে আর খুঁজতে হল না। কিছুক্ষণ পর কালোদা নিজেই এসে উপস্থিত হল। হাতে তার সেই ফুল আঁকা টিনের বাক্স। পায়ে জুতো। বাবা জিজ্ঞেস করতে কালোদা বলল, সে ইচ্ছে করে কাকটাকে মারেনি। বাগানের রোদে আচার শুকোতে দিয়ে পিসিমা বলছিলেন, কালো যেন একটু দেখে, কোনো পাখি-টাখি মুখ না দেয়। কালোদা গুলতি হাতে পাহারা দিচ্ছিল। বারবার তাড়ালেও কতকগুলো কাক উড়ে উড়ে বসতে কালোদা ভাবল, এমনি গুলতি ছুঁড়লে কাকগুলো ভয় পেয়ে পালিয়ে যাবে। কিন্তু গুলতি টুলতি হাতে নিলেই তার শরীরে যেন কিসে ভর করে। চেষ্টা করলেও তাক ফস্কায় না। ও মারতে চায়নি, কিন্তু আলগোছে গুলতি ছুঁড়তেই কী করে একটা কাকের গায়ে গিয়ে লাগল। কালোদা আর এখানে থাকবে না। গ্রামে তার দেশের বাড়িতে চলে যাবে। বাবা কালোদাকে অনেক বোঝালেন। কিন্তু তার মুখে শুধু এক কথা, আমার ওপর শয়তানের দৃষ্টি আছে। আমি বাড়ি যাব।

যাবার আগে আমার পড়ার টেবিলের ওপর তার অত সাধের গুলতিটা রেখে কালোদা আমাকে বলল, আমি আর এ সব ছোঁবো না। এটা তোকে দিয়ে গেলাম। কালোদা চলে গেল। কিছুক্ষণ পর টেবিলের ওপর গুলতিটা হঠাৎ চোখে পড়তে আমার কেন জানি গা ছমছম করে উঠল।

ছবি/সুবীর রায়

সূর্যকে কোলে নিয়ে

প্রীতিভূষণ চাকী

জানো আজ আকাশের
মন গেছে চুরি?
আনচান করে তাই
ফুল-ফুল কুঁড়ি,

পাখিদের খুঁজে ফেরে
পাগল বাতাস,
চুপচাপ পড়ে থাকে
মন-মরা ঘাস;

মেঘের তাঁবুটা ছিঁড়ে
রোদ ছুটে আসে—
সূর্যকে কোলে নিয়ে
আকাশটা হাসে!

মেরু-রহস্য

মোটরটা খুলে বাদ দেবার ফলে অভি-যাত্রীরা এবার হাইপেরিয়নকে হাল্কা বেলুনের মত উড়িয়ে দিল...

ক্যাপ্টেন ব্রিউ, আশ্চর্য মানুষ আপনি!
তা বটে!

আচমকা এক দমকা হাওয়া হাইপেরিয়নকে উড়িয়ে নিয়ে গেল তাড়া-করা ভাইকিংদের দিকে...ভয়ে তারা দৌড়তে লাগল...
ওরেব্বাবা! দানো নিশ্চয়!

বজ্জাত পুরুতমশাই আতঙ্কে মরীয়া হয়ে তাঁর ধনুকে জুড়লেন এক আগুনে তীর

আগুনে তীরটা তো হাইপেরিয়নের গ্যাসে বিস্ফোরণ ঘটাবে!
সব্বাই লাফিয়ে পড়ুন!

জ্বলন্ত তীরটা এসে হাইপেরিয়নের গায়ে লাগবার ঠিক আগের মুহূর্তেই তাঁরা লাফিয়ে পড়লেন নিরাপদ তুষার-ঢাকা উপ-ত্যকায়...আর..
1-19

ভয়ংকর এক দৈত্যের মত উড়োজাহাজটা হুড়মুড়িয়ে এসে পড়ল বড় পুরুতের গায়ের উপর...

দুম্...দুম্...দমাস্

উড়োজাহাজের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেন বড় পুরুতমশাই! ভাইকিংরা তখন ঐ পলাতকদের আবার বন্দী করল।

ওরা আবার আমাদের বিচারসভায় নিয়ে যাচ্ছে!
বড় পুরুতটি তো খতম হয়েছেন; এবার হয়তো আমরা ভাল ব্যবহার পাব!

বন্দী পলাতকদের আবার হাজির করা হল বিচারসভায়। একগুঁয়ে বড় পুরুতটি নেই, তাই এবার তাদের বিচার হল বেশ ভালই।
বিচারকমশাই বলছেন, একটা শর্তে আমরা সবাই দেশে ফিরে যেতে পারি!
কী শর্ত?

আমাদের প্রতিজ্ঞা করতে হবে যে, আমরা কখনও এই ভাইকিংদের দেশের কথা ফাঁস করব না, আর আমাদের একজনকে জামিন হিসেবে রেখে যেতে হবে!
জামিন?

হ্যাঁ, আমিই হব সেই জামিন! হাজার বছর ধরে একটা সভ্যতা একটুও বদলায়নি —যে-কোনও পুরাতাত্ত্বিকই এইরকম এক সভ্যতার স্বপ্ন দেখে!

নিরাপদে থেকো!
মশাই, আশ্চর্য সাহসী লোক আপনি!
1-26

দীর্ঘ দুর্গম যাত্রার শেষে এবার অভিযাত্রীদের ঘরে ফেরার পালা! আর কোনও দিন তারা এখানে ফিরে আসবে না, কিন্তু পৃথিবীর শেষ সীমায় অবিশ্বাস্য এই দেশের কথাও কোনওদিন তারা ভুলতে পারবে না!
শেষ
আগামী সংখ্যা থেকে 'ভুতুড়ে গাড়ি'

অনুস্বরের ধনুঃশর

কুন্তক

টুম্পির খাতায় বেশ পরিপাটি করে মলাট দিয়ে দিল নন্তু। তার পরে গোটা-গোটা অক্ষরে লিখে দিল খাতার উপর ঃ অংক খাতা।

দেখে আমি থ। নন্তুও এ-রকম লিখছে বুঝি? বলি ঃ ওটা কী লিখলি রে!

কেন? অংক খাতাই তো এটা।

অঙ্ক খাতাই তো। কিন্তু ওভাবে লিখলি কেন?

তো কীভাবে লিখব?

অ আর ক-এর মাঝখানে একটা অনুস্বর বসালি কেন?

ও! তুমি অঙ্ক লিখতে বলছ। কিন্তু এখন তো এ-রকমই লেখে সবাই। তুমি কি একটু প্রাচীনপন্থী কাকু?

খুব তো বড় বড় কথা বলতে শিখেছিস! প্রাচীনপন্থী! নবীনপন্থী হলেই বুঝি ঝুড়ি-ঝুড়ি ং আমদানি করা যায়?

আচ্ছা বলো, তুমি সংগীত লিখবে না সংগীত লিখবে?

দুটোই হয়। তবে, আমি সংগীত লিখব।

শঙ্কর না শংকর?

আমি লিখব শংকর।

বা রে বা। তুমি তো তাহলে আমারই মতো বলছ। তাহলে অংক দেখে এত আঁতকে ওঠো কেন?

বুঝেছি, মাথায় ওই ভূত চেপেছে। ওরে হাঁদা, এ-দুটোর মধ্যে একটা প্রভেদ আছে। ওই-যে তুই বলিস 'কাকুর নিয়ম', এর মধ্যেও সে-রকম একটা নিয়ম আছে। যেখানে-সেখানে ং বসালেই হল?

টুম্পি এগিয়ে এল এবার ঃ কী নিয়ম গো কাকু?

দে তো স্লেটটা। আগে কয়েকটা শব্দ লিখি দেখ্ ঃ

ভয়ঙ্কর	অঙ্ক
সঙ্গত	সঙ্গ
অহঙ্কার	শঙ্কা
সঙ্গীত	ভঙ্গি
সঙ্ঘাত	গঙ্গা
শঙ্কর	বঙ্কিম

শব্দগুলো দেখ্ তো ভালো করে।

দেখছি।

কিছু বুঝতে পারছিস? ডানদিকের আর বাঁদিকের শব্দগুচ্ছে প্রভেদ ধরতে পারছিস কিছু?

অনেকক্ষণ দেখে, মাথা নাড়িয়ে টুম্পি বলল ঃ নাঃ। আর নন্তু রইল চুপ করে।

আচ্ছা বেশ, এবার তাহলে লক্ষ করে দেখ্, একদিকের শব্দে লুকোনো আছে একটা সন্ধি, অন্যদিকে সেটা নেই। তাই না? সম্ গত, সঙ্গত। সম্ গীত, সঙ্গীত। সম্ যে একটা উপসর্গ সেটা মনে আছে তো? তেমনি সম্ ঘাত, অহম্ কার, ভয়ম্ কর, শম্ কর। সন্ধি থেকে এর একটা মানে পাওয়া যাচ্ছে, তাই না?

শম্ কর বললে কী মানে হয়? ভয়ম্ কর না-হয় ভয়-লাগানো,, অহম্ কার না-হয় নিজের কথা। শম্ কর?

কেন? শম্ মানে জানিস না? মঙ্গল। মংগল নয় কিন্তু। মঙ্গল করেন যিনি, তিনিই শম্কর। এখন, এই যে শব্দগুলির সন্ধিকে ভাঙা গেল, এসব জায়গায় ইচ্ছে করলেই অনুস্বর বসাতে পারিস। লিখতে পারিস ভয়ংকর সংগত অহংকার সংগীত সংঘাত শংকর। কিন্তু ভিতরে কোন সন্ধি নেই বলে অন্যগুলিতে আর ং চলবে না। ওসব জায়গায় লিখব, অঙ্ক সঙ্গ শঙ্কা ভঙ্গি গঙ্গা বঙ্কিম। এ-রকম আরো অনেক আছে। দেখলে নিশ্চয় টের পাবি এবার।

কাকু, আমি কিন্তু আরেকটা মিল দেখতে পাচ্ছি শব্দগুলির মধ্যে। ং দিয়ে লিখলে না বলেই দেখা যাচ্ছে ব্যাপারটা। সব জায়গাতেই ঙ। কেন?

দেখতে পাচ্ছিস? খুব ভালো। এতটাই যদি দেখলি তো আরেকটু দেখ্। ঙ-র পরে কী আছে? ক, নয়তো গ, নয়তো ঘ। ঠিক না?

ঠিক।

তাহলে এখানে ঙ আসবে না তো আর কী আসবে? সেই-যে নিজের নিজের ঘরানার কথা বলেছিলাম, মনে আছে? যার যার তার তার?

একটু বলে দাও, মনে পড়ে যাবে।

বর্গ জানিস তো? বর্গে বর্গে পাঁচ-পাঁচটা বর্ণ। ক খ গ ঘ ঙ। চ ছ জ ঝ ঞ। এইরকম। প্রত্যেকটার শেষে দেখছিস একটা ভুতুড়ে কাণ্ড আছে, মানে নাকী সুরের ব্যাপার। ঙ ঞ ণ ন। এর একটা কখনো অন্য বর্গের ঘাড়ে বসতে পারে না। আগে তো শুনেছিলি একবার, ত-বর্গের সঙ্গে ণ বসে না কখনো, আর ন চলে না ট বর্গে। সেইরকমই ক খ গ ঘ হলেই চলে আসেন পাগড়ি-মাথায় ঙ, আর চ ছ জ ঝ হলেই আসেন বোঁচকা কাঁধে ঞ। সম্গীত হলো সঙ্গীত। কিন্তু সম্চার হলো সঞ্চার। গম্তব্য গন্তব্য।

নন্তু মনে করিয়ে দেয় ঃ কিন্তু কথা হচ্ছিল তো ং নিয়ে।

হ্যাঁ ভুলিনি সেটা। সন্ধিটা ভিতরে থাকলেই ং হতে পারে, বিকল্পে। তাই বলে আমরা সংচার বা গংতব্য লিখব না তো। ক-বর্গ পরে থাকলে তবেই ম্-টা বিকল্পে ং হতে পারে। আর যদি থাকে ব বা য-এর মতো অন্তঃস্থ বর্ণ, তাহলে তো ং হতেই হবে। লিখতেই হবে সংবাদ সংবিৎ কিংবদন্তী কিংবা প্রিয়ংবদা।

এই কিংবা-টাও কি উদাহরণ, না অথবার প্রতিশব্দ?

বড্ড ফাজিল হয়েছিস।

তাহলে কি আবার অনুস্বরের বাণ ছুঁড়বে?—বলেই দৌড় লাগাল নন্তু।

হরিণের কান্না

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

দুপুরের নীচে সমস্ত নদীটা দেখাচ্ছে যেন হাজার-হাজার হীরে-বসানো বিরাট একটা অলংকার। লঞ্চে চলেছি, মাথার ওপর চিল ডাকছে ঠিকই, কিন্তু লঞ্চের ভট-ভট শব্দে স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি না। মাঝে-মাঝে ছোঁ মেরে জল থেকে মাছ তুলে নিয়ে দূরে উড়ে যাচ্ছে দেখতে পাই। আরও দূরে, আকাশের অনেক উঁচুতে তিন-চারটে চিল মানুষের হাই তোলার ভঙ্গির মতন আলতো-ভাবে ভেসে রয়েছে।

কী-একটা গ্রামের ঘাট দেখা যেতেই লঞ্চটা মাঝ-নদী ছেড়ে একটু একটু করে ডাঙার দিকে বেঁকতে লাগল। গাছের গুঁড়ি পাশাপাশি পেতে ঘাট বানানো হয়েছে, লঞ্চটা ঘাটের কাছে এসে থামল। অল্পবয়সী একটা ছেলে লম্বা এক ফালি তক্তা দিয়ে লঞ্চের গা থেকে ঘাট পর্যন্ত জুড়ে দিতেই যারা এতক্ষণ নামবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে ছিল তারা হুড়মুড় করে নেমে গেল। নিজের গ্রামের কাছে এসে মানুষ কতক্ষণ আর গ্রামের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে।

ঘাটের কাছে ডাঙায় ছোট একদল মানুষ দাঁড়িয়ে ছিল, আমি ভেবেছিলুম ওরা এখান থেকে লঞ্চে উঠবে, বা হয়তো এদেরই আত্মীয়-টাত্মীয় আসছে বলে আগে থেকে এসে ঘাটে দাঁড়িয়েছে। দেখলুম তা তো নয়, ওরা যেমন দাঁড়িয়ে ছিল তেমনই দাঁড়িয়ে রইল লঞ্চটার দিকে চেয়ে। ওরা বোধহয় গ্রামের ঘাটে লঞ্চ এলে শুধু দেখতে আসে। রোজ-রোজ ওরা কী দেখে আমি ভেবে পেলুম না। লোকগুলোর পাশেই, ওদেরই মতন, মাথায় শুধু অনেকটা ঢ্যাঙা, একদল গাছও নদীর দিকে দেখছে। লঞ্চে বসে গা-ঘেঁষাঘেঁষি গাছগুলোর দিকে চেয়ে দেখি ওদের ডালে-পাতায় এলোমেলো চৈত্রমাস খেলা করছে। কত রকম শব্দ সেই খেলার—কখনও টানা শো-শো, কখনও ভাঙা ভাঙা ঝিরিঝিরি, কখনও বা এক ঝাঁক পায়রা উঠোনের ধান খেতে খেতে আচমকা তাড়া খেয়ে ডানা ঝটপট করতে করতে উড়ে গেলে যে রকম শোনায়, তেমনি।

নদীর অলংকার চিরে লঞ্চ এগিয়ে চলল। দূর থেকে আমি পিছনে চেয়ে দেখলাম ঘাটের সেই দাঁড়িয়ে থাকা মানুষজন চলে গেছে, আর পাশের গাছগুলো আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে তেমনি দাঁড়িয়ে আছে। আমি বরাবরই দেখেছি গাছেরা কোথাও যায় না, নিজেদের আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-পড়শি, বন্ধু-বান্ধব, সন্তান-সন্ততি নিয়ে শুধু এক জায়গায় দাঁড়িয়েই থাকে, আর কোন্ দূরের পুবদিক থেকে তাদের কাছে এসে ডালপালায় আলো মাখিয়ে দিয়ে যায় ভোর বেলা, পশ্চিম দিক থেকে সূর্যাস্ত এসে তাদের ছুঁয়ে থাকে আর কত দূরের মাঠ নদী সমুদ্র পাহাড় থেকে ছুটে এসে হাওয়া তাদের সঙ্গে খেলা করে।

নদীর দু পাশে গ্রামের পর গ্রাম ফেলে এগিয়ে যাচ্ছি সুন্দরবনের দিকে। মস্ত বড় রাঙা টিপের মতন স্নিগ্ধ হয়ে সূর্য আকাশের কিনারে নেমে জল ছুঁয়ে ভেসে রয়েছে। সমস্ত নদী জুড়ে রঙের আলপনা হাওয়ায় মোমবাতির শিখার মতন তিরতির করছে। দেখতে দেখতে চলেছি, হঠাৎ সামনের একটা গ্রাম থেকে কোলাহল ভেসে এসে আমার চোখের দেখা ভেঙে দিল। লঞ্চ যতই গ্রামের কাছাকাছি হচ্ছে, কোলাহলও ততই বাড়ছে। ঘাটে ভিড়তে চেয়ে দেখি গ্রামের একটু ভেতরের দিকের মাঠে অনেক লোক মিলে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে একটা হরিণ ধরবার চেষ্টা করছে। ভয়ে দিশেহারা হরিণটা বেষ্টনীর ফাঁক-ফোঁকর খুঁজে যতই এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করছে, লোকেরাও ততই রে-রে শব্দে তাকে তাড়া করে-করে কোণঠাসা করে ফেলছে। বিকেল আর সন্ধের মাঝামাঝি সময়টা বড় বেশি দয়া ও করুণাভরা, মাঠে তখনও সেই করুণার রং শুকোতে-দেয়া কাপড়ের মতন স্পষ্ট লেগে রয়েছে, তার মধ্যে একটা হরিণের ভয় পেয়ে ছুটো-ছুটি করা দেখে আমার বুকের মধ্যে টনটন করে উঠল। এমনিতেই হরিণের, আর মেঘলা আকাশের নীচে গোরুর চোখ দেখে কার না মায়া হয়!

নামবার কথা ছিল না, আমি তবু ওই গ্রামেই নেমে পড়লুম। লোকগুলো ততক্ষণ হরিণটাকে ধরে ফেলেছে, একজন তার কোমরের গামছা দিয়ে হরিণটাকে বাঁধছে, অন্যরা তার আশ্চর্য

কী জানতে চাও

মহাকাশ থেকে এই পৃথিবী, যেদিকে তাকাও, যা-কিছু দেখো, এবং সে সম্পর্কে যত প্রশ্ন জাগে তোমার মনে, তার উত্তর এই একটি মাত্র বইয়ের মধ্যে ধরা রয়েছে।

ছোটদের বিশ্বকোষ

বাংলায় এর চেয়ে ভাল 'বুক অব নলেজ' আর কখনও হয়নি। তার কারণ, যিনি যে-বিষয়ে পারদর্শী পণ্ডিত, সেই বিষয়ে তাঁকে দিয়ে এখানে উত্তর লেখানো হয়েছে। তার উপরে আবার

পাতায় পাতায় ছবি

সম্পাদক ঃ

অধ্যাপক ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য

শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী

মোট পাঁচ খণ্ডে এ-বই সম্পূর্ণ হবে। তার মধ্যে চার খণ্ড ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম খণ্ডের দাম ১৬৲ টাকা ; দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডের প্রত্যেকটির দাম ১২৲ টাকা।

পঞ্চম খণ্ড প্রকাশের অপেক্ষায়

মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ

১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা ১২

শিং দুটো আর ঠ্যাং ধরে রেখেছে।

আমি লোকগুলোর কাছে গিয়ে বললাম, "আমি তোমাদের মিনতি করছি, হরিণটাকে তোমরা ছেড়ে দাও।"

যে লোকটা বাঁধছিল, সে হরিণের শিঙের গোড়ার বাঁধন শক্ত করতে করতে বলল, "আমি এটাকে নদীর ওপার থেকে ধরে নৌকোয় করে এতটা টেনে এনেছি ছেড়ে দেবার জন্যে নয়। ব্যাটা দিব্যি আসছিল, ডাঙায় পা দিয়েই দড়ি ছিঁড়ে দে ছুট! তা, তুমি কে বটে?"

আমি বললুম, "আমি একজন সামান্য লোক, ঘুরতে ভালো লাগে, তাই ঘুরে বেড়াই। তুমি হরিণকে এত কষ্ট দিচ্ছ, দ্যাখো, ওর চোখ দ্যাখো, তুমি কি ওকে পুষতে পারবে?"

"পুষব বলে এত মেহন্নত করছি না। এটাকে কেটে পাড়া-পড়শিদের কাছে খণ্ড-খণ্ড করে বেচব বলেই না এত ঘাম ঝরাচ্ছি!"

"বেচে তুমি কত টাকা পাবে?"

"গ্রাম-গাঁয়ে লোকের হাতে কি আর টাকা আছে? যে যা দিতে পারে। তা পনেরো-কুড়ি তো হাতে আসবে।"

আমি কুড়ি টাকা বার করে লোকটাকে দিয়ে বললুম, "হরিণটা আমাকে দাও।"

অন্য লোকেরা এতে আপত্তি করতে যাচ্ছিল, কিন্তু হরিণ যার সে একসঙ্গে কুড়ি টাকা পেয়ে শিঙে বাঁধা গামছা সুদ্ধু হরিণ আমাকে দিয়ে দিল। আমি শক্ত মুঠোয় গামছাটা ধরে হরিণটাকে লণ্ঠ ঘাটায় নিয়ে এসে নদীর তীরে বসে রইলুম। সেদিন সুন্দরবন যাবার আর কোনও লণ্ঠ ছিল না। হরিণটার দিকে তাকিয়ে দেখি ওর দুই চোখ কী-রকম ছলছল করছে। বাঁ চোখের কোনায় এক ফোঁটা জল জমে রয়েছে, তাতে সূর্যাস্তের শেষ টুকরোটা চিকচিক করছে দেখতে পেলুম।

ঘাটের কাছে একটা নৌকো আসছে দেখে আমি মাঝিকে বললুম, "নদী পার করে দিতে হবে।"

এই সব নৌকোর কাজই নদী পারাপার করা। আমি হরিণটাকে নিয়ে নৌকোয় উঠে বসলুম।

সন্ধে হয়ে আকাশে চতুর্দশীর চাঁদ উঠেছে। জ্যোৎস্না দেখলেই আমার মনে হয় যেন মাইলের পর মাইল জুঁই ফুটে আছে। দুই চোখ ভরে দেখছি, হঠাৎ ওপারের কাছাকাছি এসে নৌকোর কাছেই দেখি জ্যোৎস্না জড়ানো চঞ্চল নদীতে হরিণ আর আমার ছায়া পাশাপাশি কাঁপছে।

পাড়ে নেমে শিঙের বাঁধন খুলে হরিণটাকে আমি বনের দিকে ছেড়ে দিলুম। অল্প খানিকটা দৌড়ে গিয়ে হরিণ কী ভেবে থমকে দাঁড়াল, পিছন ফিরে আমার দিকে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থেকে আবার দৌড়ে গেল বনের মধ্যে। যতক্ষণ দেখা যায়, আমি দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে তার দৌড়নোর ছন্দ দেখতে লাগলুম।

ছবি/শুভাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য

গেছো ভূত

একটা বাড়ি ছিল। বাড়ির রং ছিল হলুদ। তার পাশেই একটা সবুজ পাতায় ঢাকা গাছ ছিল। ওই বাড়িতে একটা লোক ছিল। আর, ওই গাছটায় একটা ভূত ছিল। একদিন লোকটা বাজার থেকে মাছ কিনে এনে বাড়িতে ভাজা করে রাখল পরদিন খাবে বলে, কিন্তু রাত্তিরবেলায় সেই ভূতটা লম্বা হাত বাড়িয়ে সব মাছ তুলে নিয়ে খেয়ে ফেলল। তারপর খালি থালাটা মাটিতে ফেলে দিল ঝন্ ঝন্ করে। সেই শব্দে ঘুম ভেঙে গেল লোকটার। উঠে দেখে, গাছের ওপরে, বসে হিঁ হিঁ করে কে যেন খুব হাসছে!

তীর্থঙ্কর ঘোষ (বয়স—৫)

গল্প বলা

পম আমার ছোট বোন। তার তখন দু বছর বয়েস হতে এক মাস মাত্র বাকি। একদিন মা দুপুরে বোনকে ঘুম পাড়াচ্ছিলেন। বোন খুব বিরক্ত করছিল মাকে। মা তখন বললেন, "চুপ করো, একটা গল্প বলছি। একটা পাখি ছিল। তার নাম টিয়া। পাখিটা উড়তে উড়তে আমাদের পেয়ারা গাছে এসে বসল।"

মায়ের আর গল্প বলা হল না। পমই শুরু করল এবার—"টিয়া পাখি? উয়ে গেল। ভোঁ কয়ে উয়ে গেল। টুবাই ছিল। মিষ্টি কেল। টুবাইয়ের সাথে খেলা করল। আমি যাব।"

মায়ের আর গল্প বলা হল না, মায়ের হয়ে ওই বলে দিল গল্পটা।

শুভ্র হিমানীশ রায়চৌধুরী (বয়স—৮)

এক যে ছিল বাঘ

এক দেশে এক বিরাট বাঘ ছিল। বাঘটা খুব দুষ্টু ছিল। সে মানুষ ধরে ধরে খেত। বাঘটা খুব চালাক ছিল। সে পেছনদিক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে মানুষ মারত। একদিন এক শিকারী খুব রেগে গিয়ে বাঘটাকে গুলি করে মেরে ফেলল।

সুব্রত ঘোষ (বয়স—৫)

সুন্দরী নায়েগ্রা

আমি গত বছর চার মাসের জন্য কানাডা বেড়াতে গিয়েছিলাম। সেখানে আমরা অনেক জায়গায় ঘুরেছি। আমার সব চাইতে ভাল লেগেছে ভূগোলে পড়া সেই নায়েগ্রা জলপ্রপাত।

নায়েগ্রা এত সুন্দর যে বলার নয়। না দেখলে বিশ্বাসই করা যায় না। সবুজ ও সাদায় মেশানো জলের ধারা দুশো ফিট ওপর থেকে পড়ছে অঝোরে। তাই ভীষণ আওয়াজ। এখানে জলের ওপর রামধনুর রঙ অপূর্ব দেখায়। সেইজন্য এখানে একটি রামধনুর মতো ব্রিজ আছে। এর নাম 'রেনবো' ব্রিজ। এই ব্রিজের একদিকে কানাডা অন্যদিকে আমেরিকা। রাতের বেলায় নায়েগ্রা জলপ্রপাতে রঙবেরঙের আলো ফেলা হয়, এতে সুন্দরী নায়েগ্রা আরও সুন্দরী হয়ে ওঠে। আমার চোখের সামনে সেই সৌন্দর্য আজও ভাসছে।

সুপর্ণা চট্টোপাধ্যায় (বয়স—১৩)

চিঠি

মাসিক আনন্দমেলার জন্যে খুব আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা করে থাকি, কিন্তু পত্রিকা সবসময় সময়মত বার হয় না কেন? আপনারা কি আমাদের কথা ভাবেন না? এবার থেকে ঠিক সময়ে যেন পত্রিকা হাতে পাই। আর একটা কথা, টিনটিন কবে কলকাতায় আসছে? এলে আমাদের দেখাবেন তো?

গৌরব গোস্বামী

আমি বহুদিন থেকে মাসিক আনন্দমেলার পাঠক। আনন্দমেলার প্রতিটি সংখ্যা হাতে পেয়ে এত আনন্দ হয় যে, দুদিনেই গল্পগুলো সব শেষ হয়ে যায়। পড়াশুনো ও খেলাধুলো বিভাগ আমার ভীষণ প্রিয়। গত জ্যৈষ্ঠ মাসের আনন্দমেলার মিষ্টি বেড়ালের ছবি আমি বাঁধিয়ে কাচের আলমারিতে রেখে দিয়েছি, যে আসছে সে-ই আদর করছে ওকে।

কঙ্কণকিঙ্কিণী বন্দ্যোপাধ্যায় (বয়স—১০)

আমি মাসিক আনন্দমেলায় 'তোমাদের পাতা' ও 'টিনটিন' পড়ি। বাকি সব মা পড়ে শোনান।

শম্পা চৌধুরী (বয়স—৫)

প্রশ্ন

তুমি কেবল বকো আমায়
সত্যি কি আমি দুষ্টু?
নিত্য নতুন বায়না ধরি
হও তুমি মা রুষ্টু।
পাড়ার যত ছেলেমেয়ে
নিত্য নতুন খেলনা আনে,
কী করি মা বলো তুমি
লোভ জাগে যে মনে।

সুচেতা বর্মণ (বয়স—১২)

আমি ও রাধা

আমার নাম স্বাগতা
বন্ধুর নাম রাধা
দুজনেতে বসে গাই
সা রে গা মা পা ধা।

স্বাগতা ঘোষ (বয়স—৬)

বৃষ্টি

মেঘ জমেছে আকাশে
জোর লাগল বাতাসে
হঠাৎ শব্দ চড়বড়ম
বৃষ্টি পড়ে ঝমমঝম।

শ্রুবাবতী গোস্বামী (বয়স—১১)

৫১-এ

এক যে আছে ৫১-এ
তেঁতুলপাতা খায়,
যে দুষ্টুমি করে
তাকে ভয় দেখায়।

মহুয়া দাশগুপ্ত (বয়স—৪)

ছড়া-ছাড়া

শেফালী মাহাত্ত
শুধু ছড়া লিখত
একদিন দিদিমণি
তাকে খুব মারে
সেই দিন থেকে সে
ছড়া লেখা ছাড়ে।

লীনা রায় (বয়স—১০)

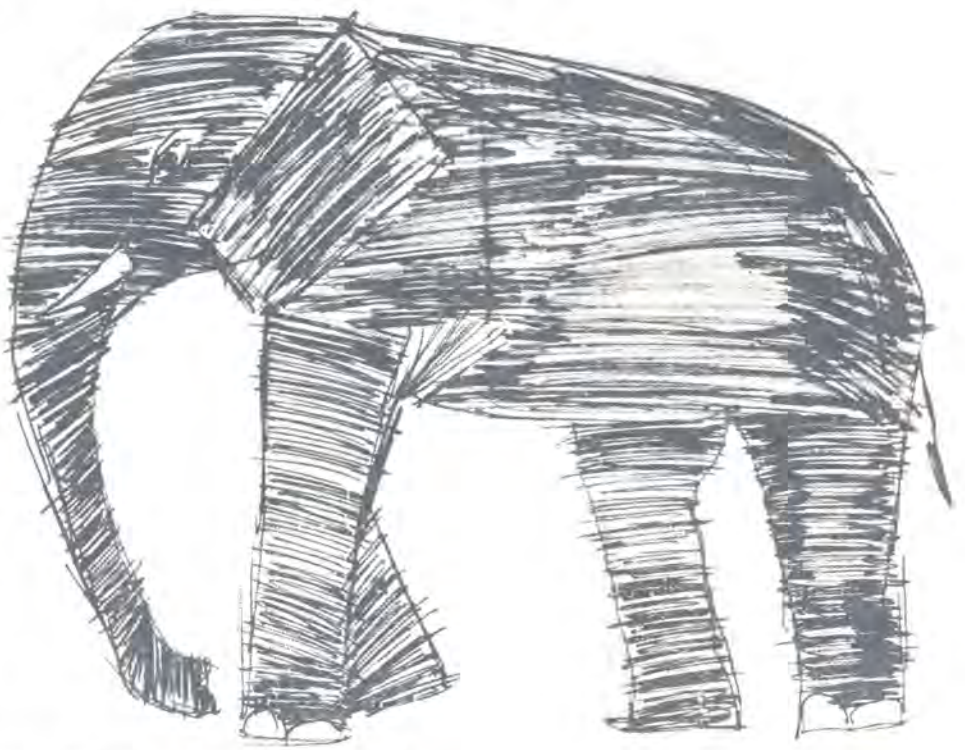

ছবি এঁকেছে সুপ্রিয় চট্টোপাধ্যায় (বয়স ১০)

ঘুড়ি ওড়াবার দিন

রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

কদিন বাদেই বিশ্বকর্মা পুজো। আকাশে-আকাশে ঘুড়ির লড়াইয়ের জন্যে ইতিমধ্যেই তোমাদের মধ্যে সাজ-সাজ রব পড়ে গেছে। কেউ মনে-মনে খুদে আলেকজান্ডার, কেউ নেপোলিয়ন আর কেউ হিটলার। ঘুড়ির দোকানগুলো তো লাটাই, মাঞ্জা আর রকমারি ঘুড়ির অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে কলকাতার প্রায় প্রতি পাড়ায়-পাড়ায় জমজমাট হয়ে উঠেছে। সেই সঙ্গে ছাদের কোণে জড় হয়েছে কাঁসর, ঘণ্টা, শাঁখ আর পটকা-বাজি। গুঁড়োনো হয়েছে মাঞ্জার কাচ, নারকোলের মালায় তৈরি হয়েছে লেই, মাঞ্জা দেবার সময় বন্ধুদের মধ্যে কে ধরবে টিপ আর কে লাটাই ধরে সুতো ছাড়তে-ছাড়তে দুটো বাঁশের খুঁটির চারপাশে ঘুরতে থাকবে সেটাও ঠিক হয়ে গেছে। অর্থাৎ যুদ্ধ শুরু হবার আগে প্রাথমিক ব্যবস্থা প্রায় সবই সম্পন্ন।

ছেলেবেলায় তোমাদের মতো আমিও ছিলাম অনেক ঘুড়ি-যুদ্ধের নায়ক। মাঞ্জা দিতে গিয়ে হাত কেটেছে, রোদ লেগে-লেগে সর্দিগর্মি হয়েছে, ভো-কাট্টা বলে চেঁচাতে-চেঁচাতে গলা ভেঙেছে। তবু ঘুড়ি কেটে, ধরে আর লটাই এনে কতবার যে মনে হয়েছে সত্যিই আমি যুদ্ধের নায়ক, সমস্ত আকাশ জুড়ে আমার অভিযান আর অধিকার! তবে এ-যুদ্ধের পরাজয়, দুঃখ, গ্লানির দিকটাও কম ছিল না। ঘুড়ির যুদ্ধে আমাকেও খোয়াতে হয়েছে অনেক সুন্দর-সুন্দর মনমাতানো ঘুড়ি। মনে পড়ে দু-আনা দামের বিশাল, মিশকালো, কড়িয়াল ঘুড়িটার কথা। সারাদিনের যুদ্ধ-শেষে সন্ধের আকাশ থেকে ঘুড়িটাকে আলতোভাবে নামিয়ে আনছি এমন সময় একটা চার পয়সার বিটকেল বাম্না এসে অতর্কিতে ওটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লে ক্লান্ত কড়িয়াল লড়াইয়ে হেরে গেল। আর আমার খুব সখের শতরঞ্জ্ ঘুড়িটা তো একদিন চড়াই করার সঙ্গে-সঙ্গেই ঝোড়ো বাতাসে উপড়ে গিয়ে নিমেষে উধাও হয়ে গেল অনেক দূরের আকাশে। আজকাল তো শতরঞ্জ্ ঘুড়ি চোখেই পড়ে না, আর আমারটা ছিল খুব উঁচু জাতের পাঁচ-রঙা শতরঞ্জ্! তোমরা কি চার-রঙা চৌখিপ্প ঘুড়ি ওড়াও আজকাল? আমাদের ছেলেবেলায় কিন্তু চৌখিপ্পকে কখনই শতরঞ্জ-এর জাতে ফেলা যেত না। শতরঞ্জ্ ছিল যুদ্ধের মেজর জেনারেল, আর চৌখিপ্প এক সাধারণ যোদ্ধা মাত্র। আমি কিন্তু স্মার্টনেসের জন্যে সবচেয়ে ভালবাসতাম চাঁদিয়াল ঘুড়িগুলোকে। ঘয়লা আর পেটকাটার দিকে ফিরেও তাকাতাম না।

ঘুড়ি-যুদ্ধের আর একটা দুঃখের দিক ছিল বাবা, কাকা, জ্যাঠামশায়ের বকুনি, মাস্টার মশাইয়ের শাসন আর অন্যের ঘুড়ি কেটে দিলে বা হাত্তা ধরলে গালাগাল খাওয়ার ব্যাপারটা। বাবা-কাকারা ছেলেবেলায় ঘুড়ি ওড়ান না এমন নয়, কিন্তু বাবা-কাকা হওয়ার পর ঘুড়ি ওড়ানোর বিষয়ে তাঁদের মনে নানান আতঙ্ক দেখা দেয়। ফলে, ঘুড়ি ওড়ানোর বিপক্ষে তাঁরা অনেক যুক্তি খাড়া করেন। কিন্তু ঘুড়ি-যুদ্ধের পথে শাসনের চেয়েও বড় বাধাটা ছিল অর্থনৈতিক। তখন আমরা হাতখরচা বা পকেটমানি বলে কিছুই পেতাম না। সুতরাং বছরে মাত্র একটা জন্মদিন একটা ভাইফোঁটা পরীক্ষায় ভাল করার জন্য পুরস্কার ইত্যাদি থেকে কিছু পয়সা উপার্জন করে বিশ্বকর্মার জন্যে অনেক আগে থেকে

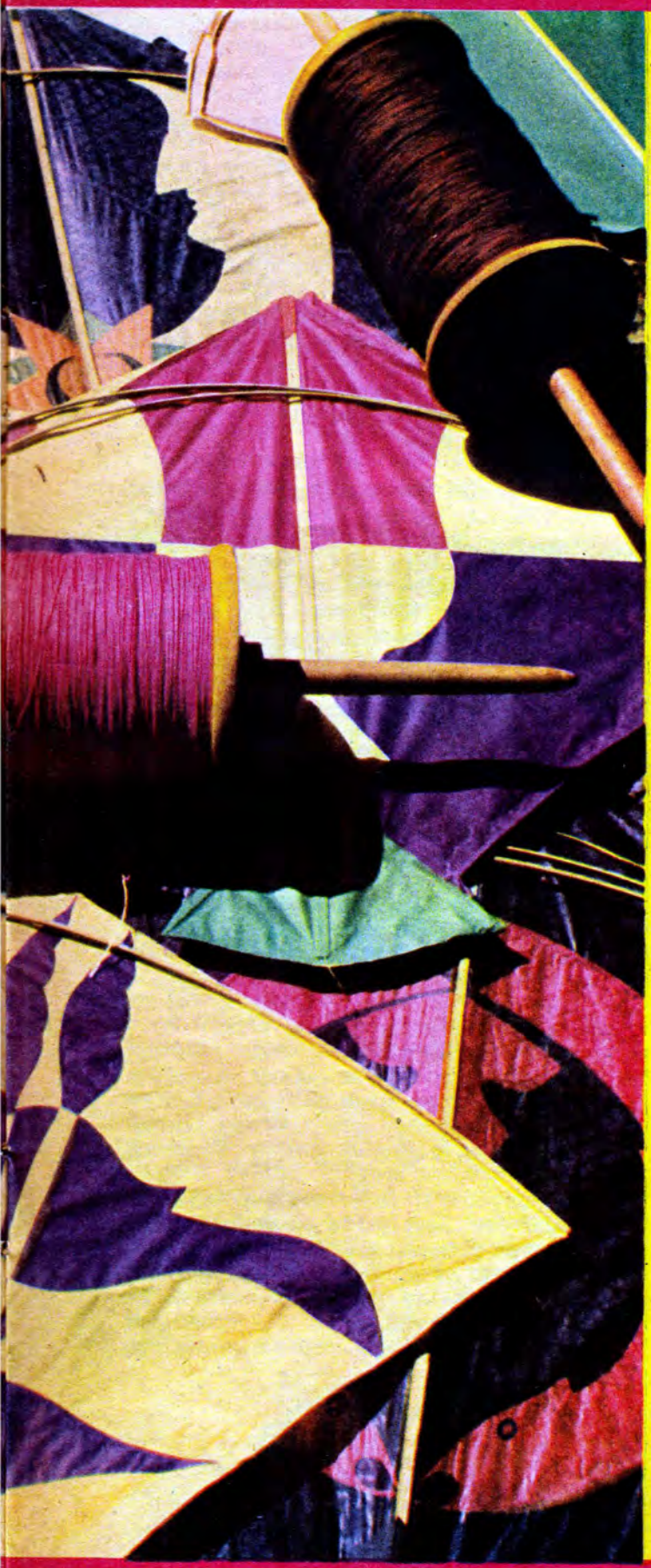

একটু-একটু করে তৈরি হতে হত।

তোমরা যারা ঘুড়ি ওড়াও, তারা নিশ্চয় জানো যে, ঘুড়ি ওড়ানোর সব কলা-কৌশল, ব্যাপার-স্যাপার বোঝাবার জন্যে অনেক রকম বিচিত্র শব্দ বাংলা ভাষায় এসেছে, যে-সবের অর্থ যারা ঘুড়ি ওড়ায় না তারা সহজে বুঝবে না। প্রায় যুদ্ধে ব্যবহৃত সাংকেতিক ভাষার মতো এই শব্দগুলি ভারি মজার। যেমন ধরো ঘুড়িটাকে মাটি থেকে আকাশে প্রায় ভাসিয়ে দেয়াকে বলে চড়াই করা। চড়াইয়ের পর লাট খাইয়ে-খাইয়ে ঘুড়িটাকে বাড়াতে হয়। লাট না খেলে বুঝতে হবে ঘুড়িটার কলে কোনো গণ্ডগোল আছে। লাট খাওয়া কিন্তু একান্ত প্রয়োজন। কেননা তা না হলে কেটে-যাওয়া ঘুড়িকে লটকানো যায় না। ঘুড়ির কাপ বা কাঠিটা কোনো দিকে ভারি থাকলে ঘুড়িটা সেই দিকে হেলে থাকে। একে বলে একবগ্গা ঘুড়ি। যেদিকে ঘুড়িটা হেলে থাকে তার উলটো দিকের কাপে কাগজের কার্নিক লাগিয়ে ঘুড়িটাকে সোজা করতে হয়। হাওয়ার জোর না থাকলে কেউ একজন ঘুড়িটাকে অনেক দূরে নিয়ে গিয়ে আকাশের দিকে ছুঁড়ে দিলে সেটাকে টেনে তুলে নিয়ে চড়াই করতে হয়। এই ছুঁড়ে দেওয়াকে বলে ধরাই দেওয়া। হাওয়ার জোর যদি একেবারেই না থাকে তাহলে ছোটো-ছোটো হ্যাঁচকা টান দিয়ে দিয়ে চড়াই করতে হয়—এরই নাম টুংকি দেওয়া। কোনো-কোনো ঘুড়ির আবার মাঝখানের কাপটা বাঁকা থাকে। সেগুলোকে একটু দুমড়ে নিয়ে মাথায় ঘষে-ঘষে সোজা করতে হয় যাকে বলে চেত্তি দেওয়া। বিহারের দিকে চেত্তিকেই বলে জিপ্পি। জিপ্পির সঙ্গে তাপ্পির যে কতোটা তফাত সেটা তো তোমরা জানোই। চেত্তির সঙ্গে হাত্তার যতটা তফাত, ঠিক ততটাই। আর ঘুড়ির দোকানে যদি কেউ একটা চোরকি আর একটা বোমা চায় তাহলে যারা ঘুড়ি ওড়ায় না তারা ভাববে লোকটা বাজির দোকানে যেতে গিয়ে ঘুড়ির দোকানে এসেছে। আসলে কিন্তু লোকটি কিনতে চাইছে দু-রকম লাটাই, চোরকি আর বোমা।

এ-ছাড়া আছে মাঞ্জার ব্যাপারের নানা খুঁটিনাটি। দু-রকম মাঞ্জা কলকাতায় চালু আছে—টানা আর লাটা। টানা মাঞ্জায় প্যাঁচের সময়ে ঘুড়ির সুতো খুব তাড়াতাড়ি টেনে নিতে হয়। এই মাঞ্জা হয় খুব মিহি, কাঁচের গুঁড়োটা একটু কম করে দিতে হয়। আর লাটা মাঞ্জায় প্যাঁচ লাগিয়ে সুতো ছাড়তে হয় খুব তাড়াতাড়ি। হাওয়ার জোর না থাকলে কিন্তু লাটা মাঞ্জায় প্যাঁচ খেলা বেশ অসুবিধের। মাঞ্জার জন্যে সাধারণত লাগে অ্যারারুট, ভাত এবং খুব মিহি কাঁচের গুঁড়ো। ডিমের মাঞ্জায় ধারটা সাংঘাতিক ভালো আসে ঠিকই, কিন্তু কোনো-কোনো ক্ষেত্রে সুতোটা তাড়াতাড়ি পচে যায়। এত হাঙ্গামা না করে অবশ্য বাজারের কেনা মাঞ্জায় কাজ চালানো যায়। কিন্তু তাতে খরচা অনেক বেশি। আর ঘুড়ি ওড়ানোর আধেক মজাই নষ্ট।

ঘুড়ি ওড়ানোর মজাটা কিন্তু প্রায় চার হাজার বছরের পুরনো হয়েও আজও নতুন। পৃথিবীর সর্বপ্রথম ঘুড়িটি খুব সম্ভব উড়েছিল চীন দেশে। এই প্রথম ঘুড়িটিকে কেমন দেখতে ছিল আমরা জানি না, কিন্তু পরবর্তী কালে চীন দেশে যেসব ঘুড়ি তৈরি হতে লাগল তাদের কোনোটিকে দেখতে ছিল ড্রাগনের মতো আর কোনোটিকে বিশাল আকৃতির ঈগল পাখির মতো। চীনারা এই ঘুড়ির সাহায্যেই গভীর খাদের ওপর দিয়ে দড়ি নিয়ে গিয়ে ঝুলন্ত সাঁকো তৈরি করত। চীন দেশে আবার বাক্স-ঘুড়ি বলে একরকম বস্তু ছিল যাতে করে চীনারা যুদ্ধের সময়ে গোপনে সৈন্য এবং চর শত্রুর ঘাঁটিতে পাঠিয়ে দিত। চীন, কোরিয়া আর

জাপানে কিন্তু ঘুড়ির খেলা এখনো খুব জোরদারভাবে চালু আছে। ওসব দেশের ঘুড়ির চেহারায় বেশ মজাদার বৈচিত্র্য চোখে পড়ে—কোনোটা উড়ন্ত বাঘ, কোনোটা মাছ আর কোনোটা পাখির মতো।

বিশেষ করে আবহাওয়া নিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য এবং আধুনিক যুদ্ধে শত্রু-ঘাঁটির গোপন ছবি তোলার উদ্দেশ্যে ঘুড়ির ব্যবহারও কম উল্লেখ্য নয়। অতীতে তো ঘুড়ির সাহায্যেই আকাশের অনেক ওপর তলা থেকে আবহাওয়ার খবর জোগাড় করে আনা হত। ১৭৫২ সালে বেনজামিন ফ্রাংকলিন ঘুড়ির সাহায্যেই প্রথম আকাশ থেকে পৃথিবীতে নামিয়ে এনেছিলেন মেঘ আর বিদ্যুতের বিষয়ে অনেক না-জানা মূল্যবান তথ্য।

ভারতবর্ষে ঘুড়ি ওড়ানোর ব্যাপারটা খুব জমজমাট হয়ে ওঠে সর্বপ্রথম দিল্লি শহরে প্রথম শাহ আলমের রাজত্বকালে। কনকাওয়া নামের যে বস্তুটিকে এই সময়ে আকাশে ওড়ানো হত সেগুলোর সঙ্গে আজকালকার ফানুশেরই সবচেয়ে বেশি মিল। কনকাওয়ার চেহারাটা ক্রমেই হয়ে উঠল মানুষ-পুতুলের মতো—নাম দেয়া হল চংগ। চংগকে লড়াইয়ে হারিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে লখনউ শহরে তৈরি হল দারুণ সব স্মার্ট, চটপটে ঘুড়ি। এদের নাম ছিল তুক্‌কল। কিন্তু তুককলের চেয়েও শক্তিমান ঘুড়ি তৈরি হল খুব শিগগির—নাম রাখা হল পতংগ্‌। এক একটা পতংগ্‌ তৈরি করতে তখনকার দিনেই খরচ পড়ত ১০০ টাকার মতো। নবাব আসফউদৌল্লার তুক্‌কল উড়ত আকাশে—সোনা রুপোর পাড় দেওয়া চোখ-ধাঁধানো ঘুড়ি। ওদিক থেকে তাঁর পতংগ্‌ বাড়াতেন ওস্তাদ মীর অমুদ। লখনউয়ের আকাশে শুরু হত শহর-মাতানো লড়াই। খোজা মিউটন আর শেখ ইমদাদও তাঁদের তুক্‌কল আর পতংগ্‌ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। পরে নবাব আমজাদ আলীর সময়ে পতংগের চেহারাটা পালটে অনেকটা বাদামের মতো হয়ে এল—নতুন নাম হল গুড্‌ডি। আর আধুনিক ঘুড়িতে যে পাতার আকারের লেজ দ্যাখো,—ওটা আবিষ্কার করেছিলেন নবাব মুহম্মদ হুসেন খাঁ সালারজংগী আর আগা আবু তোরাব খাঁ। তারপর একদিন লখনউ থেকে বিলায়েত আলি এলেন কলকাতার মেটিয়াবুরুজে। সঙ্গে আনলেন খান কয়েক গুড্‌ডি। গুড্‌ডি থেকে ঘুড়ির জন্ম এই কলকাতায়—ঘুড়ি কালচার কলকাতার একান্ত নিজস্ব ব্যাপার। কলকাতার বাবুরা এক সময়ে ঘুড়িতে একশো টাকার নোট আটকে ওড়াতেন। এখনো কলকাতার ময়দানে শহরের সেরা ঘুড়ি উড়িয়েরা প্রতিযোগিতার জন্যে আসে।

তবু যে ঘুড়ি ওড়ানোর জন্যে বড়দের কাছে মাঝে মধ্যেই বকুনি খেতে হয় তার কারণ ঘুড়ির নেশায় বিপদের ঝুঁকিও কম নয়। ন্যাড়া ছাদে ঘুড়ি ওড়ানো খুবই বিপজ্জনক। তাছাড়া একটা কাটা ঘুড়ি ধরার জন্যে দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে রাস্তায় ছুটোছুটি করার মতো বোকামির তুলনা নেই। খুব বেশি ঘুড়ি ওড়ালে চোখ এবং লেখাপড়ার ক্ষতিও নিশ্চয় হতে পারে।

কিন্তু এই ধুলোবালি কাদা মাখা শহরের হাঁপ ধরানো পরিবেশ থেকে ছুটি নিয়ে কত সহজেই আমরা ঘুড়ি দিয়ে আকাশকে ছুঁয়ে থাকতে পারি। মনে পড়ে একদিন বিকেলবেলার নীলচে আলোয় গয়ার আকাশ-গঙ্গা পাহাড়ে একটি ছেলেকে একেবারে একলা ঘুড়ি ওড়াতে দেখেছিলাম—সে যেন আকাশের সঙ্গে কথা বলছিল। তোমরা কি জানো এশিয়ার সেই নাম-না-জানা বালকের কথা, যে রাতের আকাশে উড়িয়ে দিয়েছিল এমন একটি ঘুড়ি যার সঙ্গে বাঁধা ছিল একটি সুরেলা হালকা বাঁশের বাঁশি? সে রাত্রে অনেক মানুষ ঘুমিয়ে পড়ার আগে শুনতে পেয়েছিল আকাশের গান!

ফোটো/বিশ্বরঞ্জন রক্ষিত

কেন্দ্রীয় সমাচার

মণিমেলা মহাকেন্দ্র আগামী ২১ আগস্ট ছোটদের জন্য এক আবৃত্তি প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে। ১৬ বছরের কম বয়সী যে কোনও ছেলে-মেয়ে এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারবে। নাম দেবার শেষ তারিখ ১৭ আগস্ট। যোগাযোগের ঠিকানা : মণিমেলা মহাকেন্দ্র, রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়াম, ব্লক—২, রুম—৫, কলকাতা-৭০০০২৯। ফোন: ৪৬-৯৮১০।

মণিমেলা শাখাকেন্দ্রগুলি ২৪ জুন বঙ্কিমচন্দ্রের ১৪০তম জন্মদিন এবং ১ জুলাই বিধানচন্দ্রের ৯৫তম আবির্ভাব দিবস যথাযথ নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে।

মহাকেন্দ্র কার্যালয়ে ২২ মে প্রতিনিধি সম্মেলন এবং ২৫ জুন বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। বিভিন্ন মণিমেলা থেকে অভিভাবক ও সংঘ সহায়ক সদস্যরা সভায় উপস্থিত ছিলেন। ১৯৭৬-৭৭ সালের বার্ষিক রিপোর্ট ও হিসাব এবং ১৯৭৭-৭৮ সালের বার্ষিক কর্মসূচী ও সাংগঠনিক বিষয়সমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

মণিসন্দেশ

কলকাতার অভ্যুদয় মণিমেলার বার্ষিক উৎসব ১৪ মে সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। দুর্গাপুরের বলাকা মণিমেলার ৫ম বার্ষিক উৎসব ১২ ও ১৩ মে আকর্ষণীয় ক্রীড়া প্রদর্শনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালিত হয়েছে। আসানসোলের চৈতালী মণিমেলার তৃতীয় বার্ষিক উৎসব ২১ জুন খেলাধুলো ও মণ্ডানুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়। বর্ধমানের ঐকতান মণিমেলার তৃতীয় বার্ষিক উৎসব ২৩ ও ২৪ মে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। গাইঘাটার সূর্য সেন স্মৃতি মণিমেলার ২য় বার্ষিক উৎসব সাড়ম্বরে পালিত হয়েছে। যাদবপুরের রাজাপুর মিলনী মণিমেলার ২য় বার্ষিক উৎসব ১৪ এপ্রিল বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। ২৪ পরগনার বজবজ মণিমেলার ২য় বার্ষিক উৎসব ১২ জুন বিরাট উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। গোবরডাঙ্গার শরৎ স্মৃতি মণিমেলার বর্ষপূর্তি উৎসব ১৯ জুন এক সুন্দর ঘরোয়া অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সাফল্যের সঙ্গে পালিত হয়। যাদবপুরের অনির্বাণ মণিমেলার বার্ষিক উৎসব ও শরৎ জন্মোৎসব সম্প্রতি সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়।

কলকাতার কল্লোল মণিমেলার ভাইবোনেরা আদ্যাপীঠ, দক্ষিণেশ্বর ও বেলুড়মঠ দর্শনে গিয়েছিল। গাইঘাটার সূর্য সেন স্মৃতি মণিমেলার ভাইবোনেরা মুর্শিদাবাদে এক শিক্ষাভ্রমণে গিয়েছিল। শ্যামনগরের আতপুর বৈশাখী মণিমেলা সম্প্রতি রাজগীর, গয়া, বুদ্ধগয়া, নালন্দা ইত্যাদি জায়গা ঘুরে এল।

মেদিনীপুরের ঘাটাল মণিমেলা সম্প্রতি ছোটদের জন্য ছবি আঁকা ও আলপনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল। কাঁচরাপাড়ার বিবেকানন্দ মণিমেলার বোনেরা স্থানীয় এক ভলিবল প্রতিযোগিতায় বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছে। ২৪ পরগনার দক্ষিণ বারাসত মণিমেলার বোনেরা এক খো-খো প্রতিযোগিতায় রানার্সআপ-এর সম্মান অর্জন করেছে। কলকাতার রবীন্দ্রপল্লী মণিমেলা বরানগরে অনুষ্ঠিত এক কুচকাওয়াজ প্রতিযোগিতায় প্রথম শ্রেণীর মর্যাদা লাভ করেছে।

যাদবপুরের বিবেক মণিমেলার পরিচালনায় ২৬ থেকে ২৯ মে এক ব্রতচারী শিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হল। বারুইপুরের আজাদ হিন্দ মণিমেলার বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। কসবার বোসপুকুর ধর্মতলা মণিমেলার বার্ষিক ক্রীড়া প্রদর্শনী উপলক্ষে ১৭ এপ্রিল এক অনুষ্ঠানে মণিভাইবোনেরা এক বৈচিত্র্যময় অনুষ্ঠানসূচী পরিবেশন করে। ২৪ পরগনার দক্ষিণ বারাসত মণিমেলার বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়।

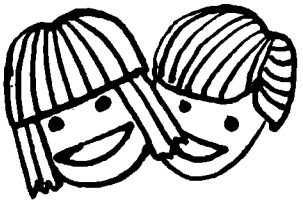

ডোডো তাতাই

লেখা/তারাপদ রায়
রেখা/কৃত্তিবাস রায়

তাতাইবাবুদের বাড়িতে ছোট উঠোন আছে, কিন্তু দুঃখের কথা এই যে, উঠোনটা সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো। তাতাইবাবুর ইচ্ছে উঠোনে গাছ লাগাবেন, একটা টোপা-কুল গাছ, একটা আমড়া, আর যদি সম্ভব হয় একটা করমচা। ডোডোবাবুদের বাড়ির পাশে ফুটপাথে ফুটে একটা কুল গাছের চারা প্রায় একহাত লম্বা হয়েছে, কী সুন্দর সবুজ পাতা, নিশ্চয়ই দু-এক বছরের মধ্যে ভাল কুল হবে এতে।

ডোডোবাবুর সঙ্গে আলোচনা করে তাতাইবাবু ঠিক করলেন গাছটাকে উঠোনে লাগাতে হবে। কিন্তু উঠোনে মাটি কোথায়? পিছনের রাস্তায় একটা কারখানা আছে, তার মধ্যে একটা ডোবা। একদিন দুপুরবেলা, গরমের ছুটির শেষের দিকে, ডোডোবাবু-তাতাইবাবু দুজনে দুটো ছুরি নিয়ে আর একটা ব্যাগ নিয়ে গোপনে ডোবার ধার থেকে মাটি আনতে গেলেন। মাটি কাটা সোজা কাজ নয়, ছুরির ডগায় এক্কেবারে দশ গ্রাম মাটি ওঠে, তিন ঘণ্টা পরিশ্রম করেও ব্যাগের একচতুর্থাংশ পূর্ণ হল না। এদিকে বাড়িতে এসে তাতাইবাবুর মায়ের কাছে প্রচণ্ড বকুনি খেতে হল। ভরদুপুরে কারখানার ডোবার ধার থেকে মাটি চুরি করা যে অন্যায় এটা তাতাইবাবু বুঝতে পারেননি, বিশেষ করে কচুগাছের নীচে নোংরা ছাইকাদা মাখা মাটি, সেটা কষ্ট করে নিয়ে এলে যে চুরি করা হয় এ ধারণাই তাতাইবাবুর নেই।

যা হোক, দুজনে মাথা নিচু করে বাঁধানো উঠোনে মাটিটুকু ঢিপি করে তার মধ্যে কুলগাছটা তুলে এনে লাগিয়ে দিলেন এবং এক বালতি জল সেই গাছে যত্ন করে ঢাললেন। গাছটি তোলার সময় শিকড় ছিঁড়ে গিয়ে থাকবে, একটু পরেই সেটা নেতিয়ে পড়ল আর এদিকে উঠোন জলে কাদায় থৈ থৈ। ফলে মায়ের কাছে আরেকবার তাতাইবাবু অপমানিত হলেন।

সন্ধ্যায় ছুটির পর তাতাইবাবুর বাবা এসে সব শুনে বললেন, "চিন্তা নেই, আমি তোমাদের টবসুদ্ধ গাছ কিনে দেব।" কিন্তু দুঃখের কথা টবে কুল বা করমচার চারা পাওয়া গেল না, একটা দোপাটি পাওয়া গেছে, সেটাকেই এখন ডোডোবাবু-তাতাইবাবু পুষছেন।

বিশ্ব-বিচিত্রা

দিদিমণি

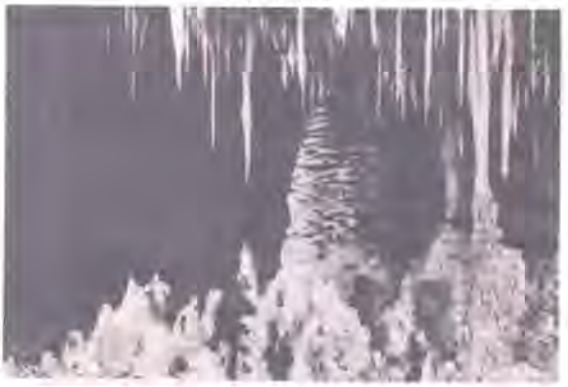

কার্স্ট অঞ্চল

যেসব জায়গার শিলায় চুনের পরিমাণ বেশি থাকে, সেখানে এক বিশেষ ধরনের ভূ-প্রকৃতি গড়ে ওঠে, তাকে সাধারণত বলা হয় কার্স্ট অঞ্চল। ইউরোপে অ্যাড্রিয়াটিক সমুদ্রের ধারে অবস্থিত যুগোস্লাভিয়ার এক স্থানে এইরকম ভূ-প্রকৃতি দেখতে পাওয়া যায়। এই রকমের ভূ-প্রকৃতি পৃথিবীর অনেক জায়গাতেই দেখা যায়। যেমন—ফ্রান্সে, উত্তর আমেরিকার পূর্বে অবস্থিত আপলেশিয়ান পর্বতে, ইংল্যান্ডের দক্ষিণে পেনাইন পার্বত্য অঞ্চলে, অস্ট্রেলিয়ার ব্লু পর্বতে, পশ্চিম হিমালয়ে, চেরাপুঞ্জির কাছে ও মধ্য প্রদেশের পাঁচমারিতে। এইসব অঞ্চলে চুনাপাথর বেশি আছে।

বৃষ্টির জলে কার্বন-ডাই-অক্সাইড থাকে এবং চুনাপাথরে গঠিত অঞ্চলে বৃষ্টি পড়লেই চুনাপাথর গলে যায়। এইভাবে সমস্ত অঞ্চলই ছিদ্রযুক্ত হয়ে পড়ে। কখনও কখনও মাটির নীচে বড় বড় গুহার সৃষ্টি হয়। মাটির ওপর দিয়ে প্রবাহিত নদী অনেক সময় ছিদ্রপথে মাটির নীচে গিয়ে সুড়ঙ্গ-পথে প্রবাহিত হতে থাকে। ওপরে থাকে শুষ্ক খাত। কখনও ছিদ্রযুক্ত ভূস্তর ভিতরে ভিতরে এতই ফাঁপা হয়ে যায় যে, সমস্ত ভূস্তরই হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে যায়। মাটির নীচের গহ্বর ও সুড়ঙ্গ-পথ অনেক সময় অনেক মাইল লম্বা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ম্যামথ গুহার নিকটবর্তী অঞ্চলে অনেক গুহা ও সুড়ঙ্গ-পথ আছে, এগুলির মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ২০০ মাইল। অস্ট্রেলিয়ার নিউসাউথ ওয়েলসের জেনোলান ক্যাভারন পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম।

কিন্তু চুনাপাথর অঞ্চলের সবচেয়ে বৈচিত্র্যময় সৃষ্টি দুটির নাম হল স্ট্যালাকটাইট ও স্ট্যালাগমাইট। চুন যখন বৃষ্টির জলে গলে যায়, তখন এক-এক ফোঁটা করে জল গুহার ছাদ চুঁইয়ে গুহার ভিতরের ছাদে এসে ঝুলতে থাকে। সেই ফোঁটাই মাটিতে পড়ে যায় এক সময়ে। এক সময়ে বৃষ্টির জল শুকিয়ে যায় এবং ওপরে যেখানে জল চুঁইয়ে পড়েছিল আর নীচে যেখানে জল ঝরে পড়েছিল সেখানে সামান্য চুনের অংশ জমা হয়ে যায়। এইভাবে বছরের পর বছর ধরে বৃষ্টির ফোঁটার সঙ্গে সঙ্গে চুনের ফোঁটা পড়ে পড়ে গুহার ভিতরের ছাদে ও নীচে চুন জমা হতে থাকে। নীচের চুন-জমা অংশটি হয় মোটা এবং খাটো, এগুলিকে বলা হয় স্ট্যালাগমাইট, ওপরের চুন-জমা অংশটি হয় সরু এবং লম্বা, একে বলা হয় স্ট্যালাকটাইট।

ক্রমশ চুন জমা হতে হতে ওপর ও নীচের অংশ জুড়ে একটি চুনের থামের সৃষ্টি হয়। কার্স্ট বা চুনাপাথরময় অঞ্চলের মাটির নীচের গহ্বরে এমনই অজস্র স্ট্যালাকটাইট ও স্ট্যালাগমাইট দেখতে পাওয়া যায়। এই রকম এক-একটি স্ট্যালাকটাইট ও স্ট্যালাগমাইটের থাম তৈরি করতে অবশ্য প্রকৃতির হাজার হাজার বছর সময় লেগে যায়। কোনো কোনো অঞ্চলের স্ট্যালাকটাইট স্ট্যালাগমাইট হাজার বছরে এক ইঞ্চিরও কম বৃদ্ধি পায়। গুহার ভিতর এইসব অদ্ভুত থাম আর সুড়ঙ্গের মধ্যে নদী থাকলে কী হবে, চুনাপাথরময় অঞ্চলের বাইরেটা রুক্ষ ও শুষ্ক প্রকৃতির। চুনাপাথরে শ্রীহীন ছোট-ছোট ঘাস ছাড়া আর কিছুই জন্মায় না।

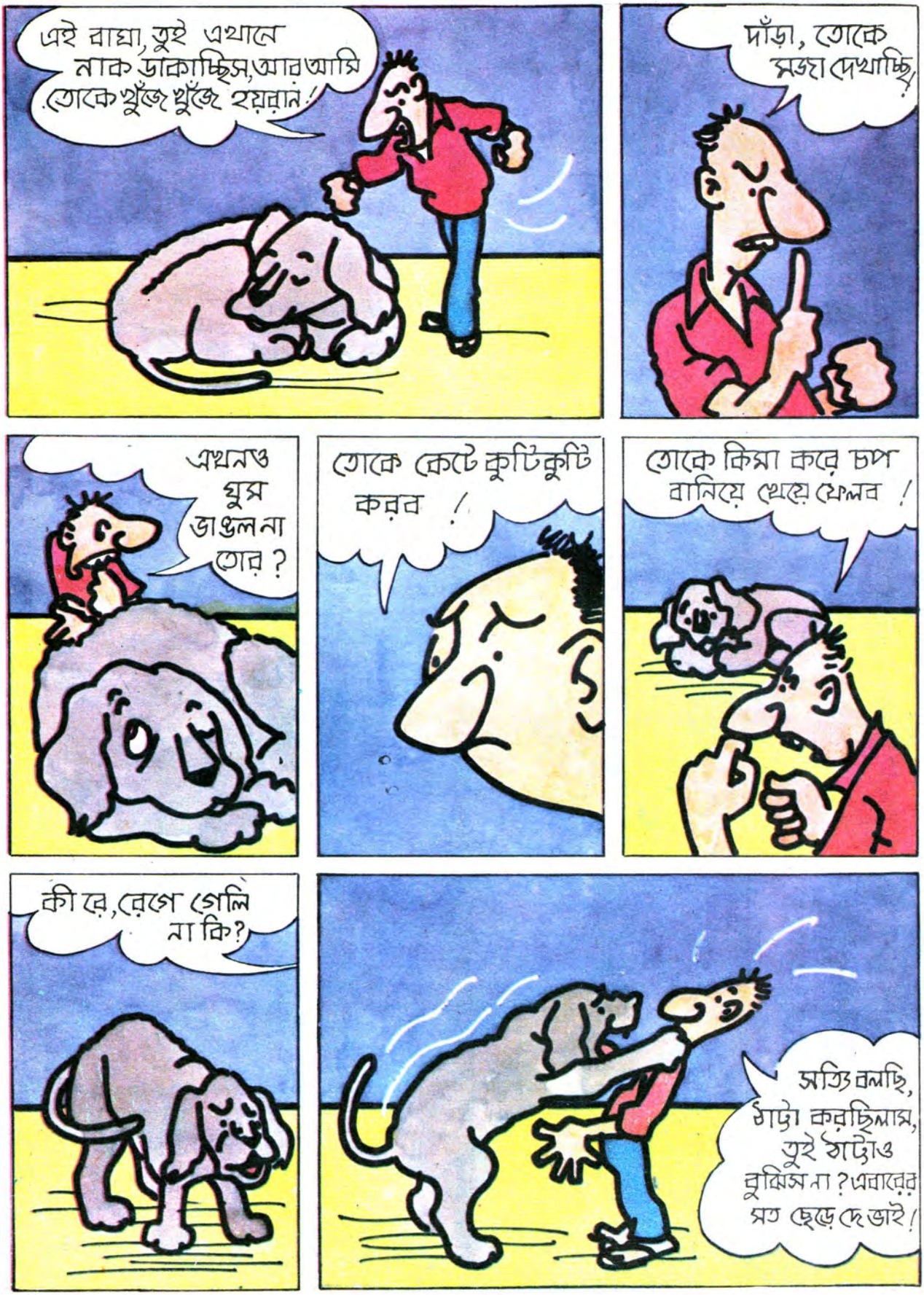
এই বাঘা, তুই এখানে নাক ডাকাচ্ছিস, আর আমি তোকে খুঁজে খুঁজে হয়রান!
দাঁড়া, তোকে মজা দেখাচ্ছি!
এখনও ঘুম ভাঙলনা তোর?
তোকে কেটে কুটিকুটি করব!
তোকে কিমা করে চপ বানিয়ে খেয়ে ফেলব!
কী রে, রেগে গেলি না কি?
সত্যি বলছি, গাট্টা করছিলাম, তুই গাট্টাও বুঝিস না? এবারের মত ছেড়ে দে ভাই!

শিল্পী ঃ পম্পা পাল (বয়স—১১)

আটখানা

এবারের আট টুকরো দিয়ে যে একটা মানুষ বানানো হয়েছে সেটা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ। কিন্তু এই মানুষটা যে বিপদে পড়েছে সেটা কি জানো? বর্ষায় পিছল রাস্তা দিয়ে তড়বড় করে হাঁটছিল, ব্যাস, কিছুদূর যেতেই পা পিছলে আলুর দম, তোমরা দেখ না কেউ ওকে তুলে ধরতে পার কি না! আগে আট টুকরো দিয়ে ওকে বানিয়ে নাও, তারপর তো তুলবে! সমাধান তো আছেই আগামী সংখ্যায়।

গতবারের **উত্তর**

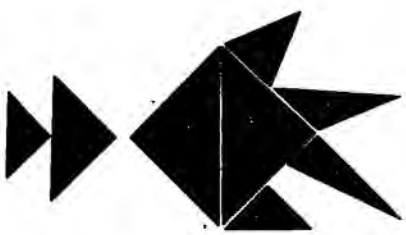

২৮ **অসিত পাল**

ধাঁধা

খেলাটা শুরু হয়েছিল সীমামাসীকে নিয়ে।

"সীমামাসী সব দিক থেকেই সীমামাসী।" গাড়িতে উঠেই বলল ছোট্কা।

কথাটা বুঝতে না পেরে সীমামাসী কিছুটা অবাক চোখে চেয়ে থাকে ছোট্কার দিকে। ছোট্কা আড়-চোখে একবার দেখে নিল সীমামাসীকে। তারপর মজার মুখ করে বলল,

"বলছি, তুমি যদি উল্টেও যাও সীমামাসী, তবু তুমি সীমামাসীই থাকবে।"

"এ আবার কেমনতর কথা! এই চেহারা নিয়ে উল্টোলে আমি কি আর আমি থাকব রে! নাকি কেউ থাকে!" দীর্ঘশ্বাস ফেলে সীমামাসী বলল, "আর গাড়িতে চেপে এসব অলুক্ষুনে কথা বলতে নেই। কী বলতে কী হয় কে জানে। মা তারা, মা গো—" দুহাত কপালে ঠেকে সীমামাসীর।

সীমামাসীর গাড়িতে চেপে আমরা বেড়াতে যাচ্ছি। কলকাতা থেকে হাজারিবাগ। ছোট্কা হঠাৎ সীমা-মাসীকেই খেপাতে চাইছে কেন, আমার মাথায় ঢোকে না। সীমামাসী যেন একটু ক্ষুণ্ণই মনে হয় ছোট্কার কথায়।

ছোট্কা এবার আমার দিকে চেয়ে বলল "সীমা-মাসী কথাটা উল্টো দিক থেকে পড়লে কী হয়, বলো তো সতুবাবু।"

"সী-মা-মা-সী।" উল্টো দিক থেকে আস্তে আস্তে উচ্চারণ করি আমি। ছোট্কা হো-হো করে হেসে বলল, "দেখলে তো, সীমামাসী উল্টোলেও সীমামাসী!"

"তুই এই উল্টোবার কথা বলছিস? ধন্যি ছেলে বাপু।" সীমামাসীর মুখে এতক্ষণে স্বস্তির চিহ্ন ফুটে ওঠে। একগাল হেসে বলল, "এমন সব নাম নিয়ে আমরাও ছোটবেলায় কত খেলেছি, উল্টো করে পড়লেও যা একই থাকে। নবজীবন, সুবললাল বসু, রমাকান্ত কামার—"

সীমামাসীর কথা শেষ হবার আগেই ছোট্কা আমার হাতে চিমটি কেটে বলে "কী কাণ্ড! দ্যাখ তো, গাড়িটা মোট কত মাইল পার হয়েছে। শিগগির!"

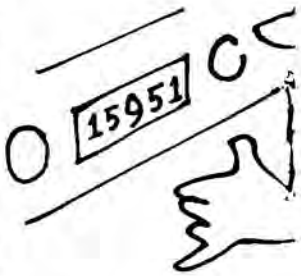

আমি তাড়াতাড়ি ওডো
১৫৯৫১—এই সংখ্যাটা লেখা

"এটাও উল্টো দিক
ছোট্কা বলল, "উল্টো দিক
তাই তো। উল্টো দিব

"এমন দেখা যায় না ক
উঠল, "কী আশ্চর্য যোগাযো

"আবার দেখা যাবে। ষ
গাড়িটা চলে। দু-ঘণ্টা এই
সংখ্যা উঠবে ওডোমিটারে,
পড়লে বদলাবে না।" ছোট্ব

"কী করে?" সবাই প্রায়
ছোট্কা তক্ষুনি মুখে-মুখে
সত্যিই তাই। বলতে পারো, দু
গেল ওই রকম আরেকটি
মিটারে যা উল্টো সোজা দু-
হোক এবারের **প্রথম ধাঁধা।**

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ কমলিব
বোন। আপন বোন দুজনে।
তারিখে। অথচ যমজ বোন
হতে পারে?

তৃতীয় ধাঁধা ॥ কোন্
১৪, ২৮, ৪৯, ৬৫, ৩৫,

চতুর্থ ধাঁধা ॥ ক ও খ-এর
থেকে ৩ কম, কিন্তু খ-এর

গতবারের **উত্তর ॥**

(১) ৩০১টা ডিম ছিল
গুরুর অঙ্ক।

(২) ১৫ সংখ্যাটি বেমা
উৎপাদক নেই।

(৩) ১ (৪) প্রথমে যাবে
নৌকো নিয়ে ফিরে আসবে।
বাবা যাবে ওপারে। অন্য
এসে ভাইকে নিয়ে ফিরে যা

সত্যসন্ধ

ছবি/অহিভূষণ মালিক

মিটারে চোখ রাখি। দেখি,
রয়েছে।
পড়লে একই থাকছে।"
থেকে পড়ে দ্যাখ।"
ক থেকেও সেই ১৫৯৫১।
খনো!" সীমামাসী বলে
গো। মা তারা, মা গো!"
দি ঘণ্টা-দুই এই স্পীডেই
স্পীডে গাড়ি চললে যে-
সেটাও উল্টো দিক থেকে
কা বলল।
একসঙ্গে প্রশ্ন করে বসল।
অঙ্ক কষে দেখিয়ে দিল।
ু-ঘণ্টায় কমপক্ষে কত মাইল
সংখ্যা ফুটে উঠবে ওডো-
-দিক থেকেই এক? এটাই

কা আর মুকুলিকা দুই
। দুজনেই জন্মেছে ২ ভাদ্র
নয় তারা। কী করে এমন

ংখ্যাটি বেমানান?
২১।
যোগফল ১১৬। ক গ-এর
কে ৪ বেশী। গ কত?

কুড়িতে। পরিষ্কার ল সা

ানান। অন্য সংখ্যাগুলোর

দুই ছেলে। এক ছেলে
তাকে রেখে নৌকো নিয়ে
ছেলেটি নৌকো চালিয়ে
বে।

কিসের ফটো

উত্তর আগামী সংখ্যায়/ফটো : তপন দাশ

গতবারে ছিল ক্রিকেট-বলের ছবি। সেলাই দেখে চিনতে পেরেছ নিশ্চয়?

কিসের ছবি

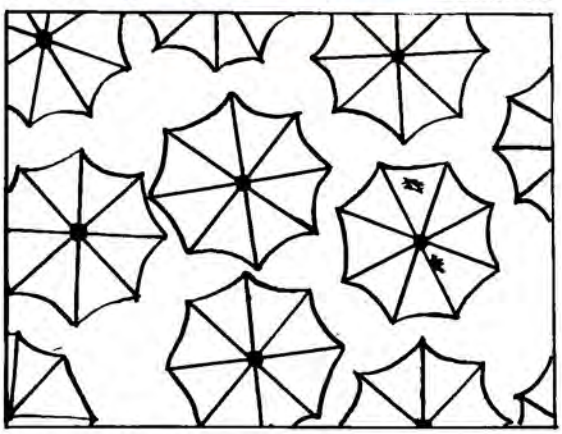

দেখে মনে হতে পারে মাকড়সার জাল, অথবা ছাপা শাড়ির কোন অংশ বা ক্রীসমাসের নানা আকারের তারা। ছবিটা অবশ্য ওসবের কিছুই নয়, চলতে ফিরতে তোমরাও এ দৃশ্য বহুবার দেখেছ। এই তো কদিন আগে প্রচণ্ড বৃষ্টিতে বাড়ি থেকে আর বেরুতে পারলাম না, জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখছিলাম রাস্তায় কতটা জল জমেছে! তাকিয়ে দেখি এই দৃশ্য! নীচে পিল-পিল করে হেঁটে চলেছে কালো কালো গোল ছাতা। তার তলায় মানুষ আর দেখাই যাচ্ছে না। কখনও বা ছাতায় ছাতায় লাগছে ধাক্কা। এক ছাতা আর এক ছাতাকে শাসিয়ে পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। একটা তালি-মারা ছাতাও নজরে পড়ল। তোমরাও এতক্ষণে আমার সঙ্গে ব্যাপারটা লক্ষ করতে পেরেছ নিশ্চয়ই?

চিত্রপাল

শব্দ-সন্ধান

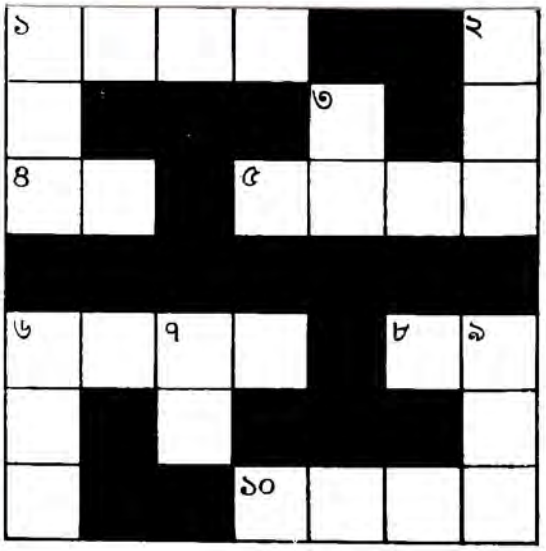

জ্যৈষ্ঠতে রামায়ণ নিয়ে একটা শব্দ-সন্ধান করেছিলে তোমরা, এবারে মহাভারত নিয়ে একটা করে দেখাও তো! কাকে আর দেখাবে—নিজেদেরই।

সংকেত : পাশাপাশি : (১) এই নামে ভারতে এখন একজন পৃথিবীবিস্ময় অঙ্ক-কষিয়ে আছেন। (৪) নৌকোর হালও বোঝায়। (৫) পাণ্ডবদের পিতামহী। (৬) নির্ভীক ও মনস্বী ছিলেন বলে এই নাম। (৮) বিখ্যাত দানশীল রাজা। (১০) উপসর্গে বাণ জুড়লে কোন্ ঋষির নাম হবে?

উপর-নীচ : (১) গলায় মরা সাপ নিয়েও ধ্যান করেছিলেন কোন্ মুনি? (২) কৌরবদের পিতামহী। (৩) কোন্ রাজ-কন্যা পরজন্মে ভীষ্ম বধের কারণ হয়েছিলেন? (৬) গাছ হলেই কবিরাজী ওষুধে লাগে। (৭) বিশ্বকর্মার সমতুল্য শিল্পী। (৯) একটি বাংলা প্রবচনে এঁর নাম পাওয়া যায়।

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গতবারের সমাধান

১রা	জা	ভা	২ত	খা	ও	য়া
■	■	■	রা	■	■	■
■	৩ক	৪লা	ই	৫কু	ণ্ডা	■
৬ত	■	ত	■	ল	■	৭দা
ম	■	মা	■	টি	■	র্জি
লু	■	■	■	■	■	লি
৮ক	ল্যা	ণী	■	৯ক্যা	নি	ং

নেস্টরের কী হল?
নির্ঘাত পালিয়েছে!
নিঃশব্দে এগোও!
ঘেউ! ঘেউ!
?
ঘেউ! ঘেউ!
দে! কামড়ে দে!
?
ঘেউ! ঘেউ!
?
কুকুরটাকে আটকে রাখো! নইলে তোমাদেরই গুলি করব।
কুকুর লেলিয়ে দিলেই গুলি করব!
আরে, চেঁচাচ্ছিস কেন? শান্ত হ'।
নাও, এবারে বাড়ির দিকে চলো।
ঘেউ! ঘেউ!
আরে, কর্তারা দেখছি বিপাকে পড়েছেন।

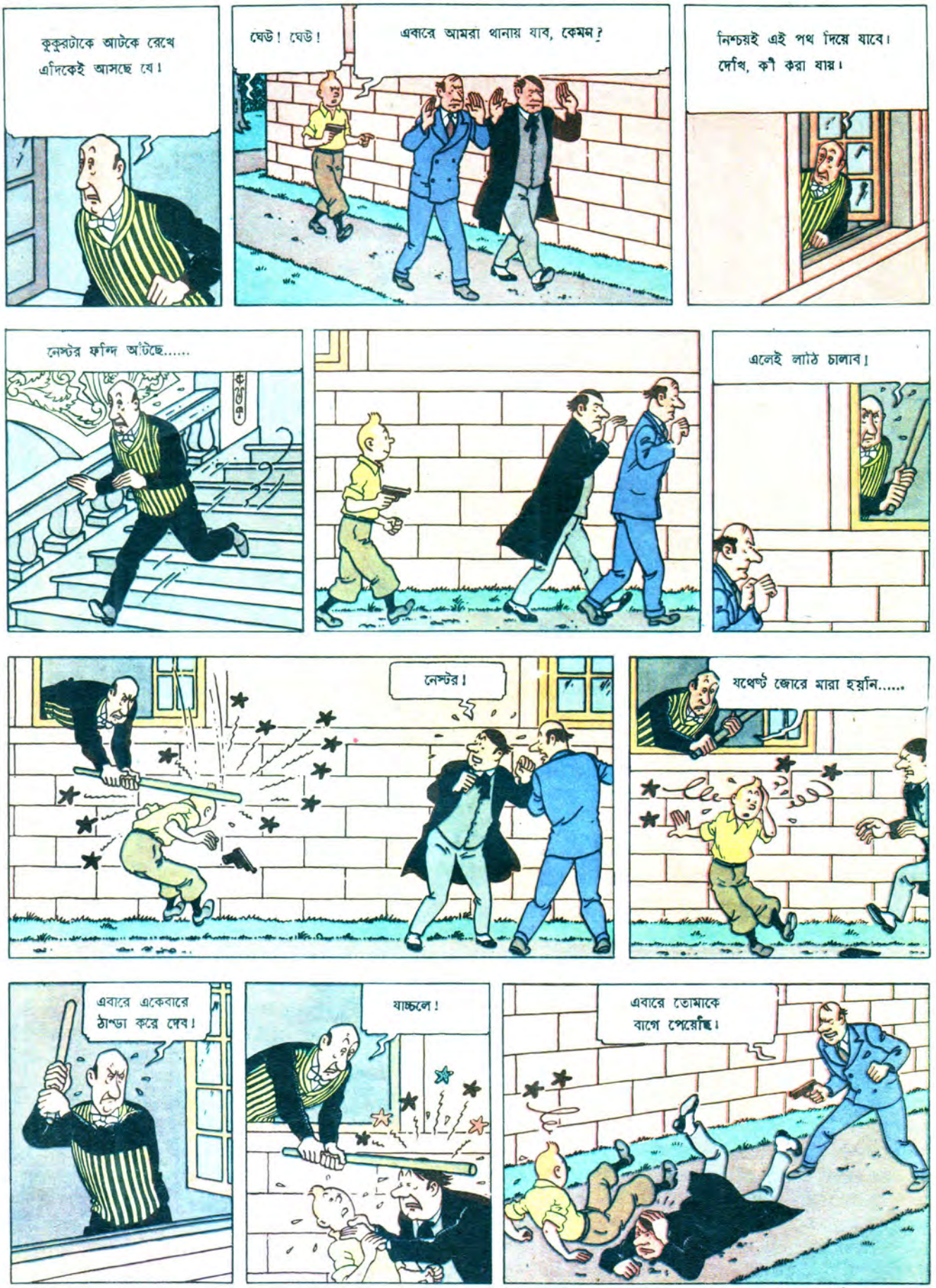

(এরপর চৌত্রিশের পাতায়)

বেলতলা বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা কী বলেন

১৯২০ সালের ২ জুলাই একজন শিক্ষয়িত্রী, ছ-সাত জন ছাত্রী আর একটি মাদুর নিয়ে ২ নম্বর বেলতলা রোডে বেলতলা গার্লস স্কুলের পত্তন হয়। নারী শিক্ষা-সমিতির পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টির তার পরের ইতিহাস সুদীর্ঘ। এক কথায় তা সংগ্রামের। এগিয়ে চলার।

শ্রীমতী অপর্ণা সেন ১৯৬২ সাল থেকে প্রধান শিক্ষিকা। অবশ্য বেলতলা বালিকা বিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ১৯৩৯ থেকে। সেই ছ-সাতটি মেয়ের একজন, অনিলা গুহ (এখন মুখোপাধ্যায়) সহকারী প্রধান শিক্ষিকা। এঁদের সঙ্গে এ বি টি এ খ্যাত অনিলা দেবীও এই স্কুলে আছেন। স্কুলটি থেকে ফাইনাল পরীক্ষায় মাঝে মাঝে স্ট্যান্ড করে। প্রথম ডিভিশনের সংখ্যা বেশ ভালই। আর জাতীয় মেধা বৃত্তির তালিকায় বেলতলা বালিকা বিদ্যালয়ের কেউ না কেউ তো থাকেই। শুধু লেখাপড়াতেই নয়, জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন এই স্কুলের প্রাক্তন ছাত্রীদের অনেকেই। যেমন—মহাশ্বেতা দেবী, কবিতা সিংহ, তপতী রায়, রত্না চক্রবর্তী, করুণা সাহা, প্রতিমা মুখোপাধ্যায়, পূর্বা দাম, সাবিত্রী ঘোষ, মঞ্জুশ্রী চাকী, বিচারপতি পদ্মা দেবী, সুচিত্রা সেন, সুপ্রিয়া চৌধুরী, বিনতা রায়, ললিতা চট্টোপাধ্যায়। আর সত্যজিৎ রায়ের পথের পাঁচালীর দুর্গা সুহাস (উমা) দাশগুপ্ত।

"দুর্গাকে আমিই বেছে দিয়েছিলাম," শ্রীমতী সেন একটু হেসে বললেন।

লেখাপড়ার প্রসঙ্গে ফিরে এসে শ্রীমতী সেনকে প্রশ্ন করি ভাল উত্তরের মানদণ্ড সম্পর্কে। বললেন, "সে কি একটা? আলাদা করে কোনটার কথাই বা বলি! তবে সবচেয়ে বেশি যেগুলি দরকার সেগুলি হল উপস্থাপন পদ্ধতি, প্রকাশভঙ্গী আর স্বকীয়তা। ধরেই নিচ্ছি, যে ভাল উত্তর লিখছে তার ভাষা এবং বিষয়বস্তু এই দুয়ের উপরই দখল আছে। আর উত্তর নির্ভুল, হাতের লেখা সুন্দর হওয়া এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা তো একেবারে গোড়ার কথা।"

দেখলাম, শ্রীমতী সেন মুখস্থ লেখা ব্যাপারটা আদৌ পছন্দ করেন না। তিনি বললেন, "ওতে পরীক্ষকের ধারণা খারাপ হয়। যেমন-তেমন একটা নম্বর বসিয়ে দেন তাঁরা। তাছাড়া এখনও উত্তরের আরম্ভে 'পূর্বেই বলিয়াছি' বা অন্য কোথাও 'অমুক অমুক পৃষ্ঠায় দেখ' এসবের ছড়াছড়ি। কীরকম বোকার মত মুখস্থ দেখুন তো!"

"কিন্তু ভাল ভাল ছেলে-মেয়েদের অনেকেই তো পাঁচ-সাতটা বই থেকে মিলিয়ে উত্তর তৈরি করে সেটা মুখস্থ লেখে। সেক্ষেত্রে?"

শ্রীমতী সেনের বক্তব্য, ওভাবে তৈরি করা উত্তর যা দাঁড়াচ্ছে সেটা সেই ছাত্র বা ছাত্রীর নিজস্ব জিনিস হয়ে যাচ্ছে। সে 'আপন মনের মাধুরী' মিশিয়েই উত্তর রচনা করছে। সে উত্তর ভাল নম্বর পাবে না কেন?

ভালদের কথা ছেড়ে সাধারণদের বিষয়ে এসে গেলাম। আর সাধারণের কথা উঠলেই যেন অনিবার্যভাবেই ইংরেজির প্রসঙ্গটা উঠে পড়ে। বললাম, ইংরেজিকে নিয়ে অধিকাংশ ছাত্র ছাত্রীই ভয় পায় কেন? এর কি কোনও প্রতিকার নেই?

তিনি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, "গ্রামার-কে এড়িয়ে ইংরেজি আয়ত্ত করার চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। তাছাড়া সিলেবাসের গ্রামার অংশ থেকেও তো অল্পায়াসে নম্বর তুলতে পারা যায়। ভাষাটা বিদেশী। ওতে সকলের দক্ষতা সমান হবে, এ-রকম আশা করা অন্যায়। কিন্তু সেন্টেন্স লেখাটা—অবশ্যই নির্ভুলভাবে—তাদের না শিখলেই নয়। সাবজেক্ট, ভার্ব আর অবজেক্ট ব্যবহার করে ছোট ছোট সেন্টেন্স দাঁড় করাক না। আর সঙ্গে সঙ্গে টেন্স-এর ব্যবহারটা রপ্ত করুক। পড়ানোর সময় শিক্ষক - শিক্ষিকারাও ভার্বের উপর জোর দিলে ভাল হয়।"

"আর?"

"শক্ত শক্ত শব্দের অর্থ, সমার্থক ও বিভিন্নার্থক শব্দগুলি শেখা, বার বার টেক্সট 'রীডিং' পড়া। বাংলাতেও মূল গদ্যাংশ বা কবিতা একাধিকবার ভাল করে পড়া উচিত।"

ব্যাকরণ সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমতী সেন বললেন, ব্যাকরণে স্কুলের নির্দিষ্ট বই থেকে উদাহরণ না দিয়ে বাইরে থেকে দেবার চেষ্টা করলেই বোঝা যাবে মূল সূত্রটি আয়ত্ত হচ্ছে না।

মনে মনে শ্রীমতী সেনের দৃষ্টিভঙ্গির প্রশংসা করে জানতে চাইলাম রচনা সম্পর্কে।

রচনা প্রসঙ্গে তিনি জানালেন, "বাংলায় কার কতটা দখল তা দেখাবার আসল জায়গা হচ্ছে রচনা। কিন্তু দুঃখের কথা, তা ভুলে গিয়ে ছেলেমেয়েরা কয়েকটা স্ট্যান্ডার্ড বই থেকে সম্ভাব্য রচনা তৈরি করে যায়। রচনার সূচনা খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। ওটি এমনভাবে হওয়া চাই যেন পরীক্ষক নিশ্চিত হন যে, সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তুর উপর পরীক্ষার্থীর পূর্ণ দখল আছে। মধ্যের পয়েন্ট-

গুলিও সুবিন্যস্ত হবে। আর, উপসংহারটিও খাপছাড়া বা এলোমেলো হবে না। সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়বস্তুটির মূল্যায়ন করতে পারলে খুব ভাল হয়।"

"যেমন?"

"যেমন ধরুন, দূরদর্শন সম্পর্কে রচনা। উপসংহারে গণ-সংযোগ ব্যবস্থায় টেলিভিশনের গুরুত্ব আলোচনা থেকে অশিক্ষা দূর করার ব্যাপারে সম্প্রতি একে কীভাবে কাজে লাগানো হচ্ছে ওই পয়েন্টে চলে গিয়ে বিষয়টির অসীম সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিয়ে কেউ রচনা শেষ করলে বেশ ভাল হয় না?"

অঙ্ক নিয়ে শ্রীমতী সেনের একটি বড় আক্ষেপ আছে। অন্য অনেকের সঙ্গে তিনি একমত যে, বিষয়টির সিলেবাস গুরুভার। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ওর প্রতি সুবিচার করা যায় না।

বিজ্ঞানের বিষয়গুলিতে ল্যাবরেটরি ব্যবহার ও অঙ্কনের উপর জোর দিলেন শ্রীমতী সেন। তেমনি ভূগোলে, ইতিহাসে ম্যাপ, টাইম-চার্ট, স্কেচ ইত্যাদির উপর। এই সব বিষয়েই একাধিক বই পড়া দরকার সেটা জানাতে ভুললেন না।

সংস্কৃত সম্পর্কে ও'র মত—কম খেটে বেশী নম্বর তুলতে এর মত আর কোনো সাবজেক্ট নেই। ভাল মন্দ সব ছাত্র-ছাত্রীরই কথাটা মনে রাখা উচিত।

বেলতলা গার্লস স্কুলের প্রধান-শিক্ষিকার কাছে দু'টি নতুন কথা শুনলাম। প্রথমত, ক্লাসের পড়া কিছুটা এগিয়ে গেলেই যতটা পড়ানো হয়েছে তার উপর পরীক্ষা নেওয়ার কথা। উনি বললেন, এই পদ্ধতিতে ছাত্রছাত্রীদের অনেক সুবিধা হয়। পড়াটা এগিয়ে থাকে। এটা অবশ্য সাপ্তাহিক পরীক্ষা নয়। পরীক্ষার খাতা ক্লাসে দেখিয়ে কে কী ভুল করেছে সেগুলি নিয়ে আলোচনা করলেও খুব ভাল ফল পাওয়া যেতে পারে। এটা করলে ভবিষ্যতে ওই সব ভুলের পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা খুব কমে যায়। ছাত্র-ছাত্রীরা সাধারণত খাতা পেয়ে নম্বরের টোটাল মিলিয়ে ছেড়ে দেয়। বা কম নম্বর পাওয়া নিয়ে বাদানুবাদের সৃষ্টি করে। সেটা ঠিক নয়।

শ্রীমতী সেন আনন্দমেলার লেখাপড়া বিভাগটির প্রশংসা করলেন।

কীভাবে তৈরি হচ্ছে ক্লাস টেন-এর ফার্স্ট গার্ল

ক্লাস টেন-এর ফার্স্ট গার্ল শ্রেয়া দত্তকে 'দেখিয়ে দেবার' লোক অনেক। বাবা শিশিরকুমার দত্ত ইংরেজী দেখান। উনি কলকাতা হাইকোর্টের এডিশনাল রেজিস্ট্রার। দুই দিদি ডাক্তারি পড়ছে ফিজিক্যাল ও লাইফ-সায়েন্স এবং অঙ্কের পেপার দুটিতে (শ্রেয়ার অতিরিক্ত বিষয় অঙ্ক) তারা ছোট বোনটিকে সমস্ত রকমে সাহায্য করে। মাঝে মাঝে মা-ও ওর পড়াশুনো দেখেন। দিদিরা, মা—সবাই বেলতলা গার্লস স্কুলেই পড়েছেন। কিছুদিন হল একজন গৃহশিক্ষকও রাখা হয়েছে শ্রেয়ার জন্যে।

স্কুলে শ্রেয়া দত্ত বরাবরই ফার্স্ট হয়ে আসছে।

"মাধ্যমিকে স্ট্যান্ড করতে পারবে?"

উত্তরে লাজুক হাসি হেসে শ্রেয়া বলল, "অত আশা করি না।"

দিনে ও পাঁচ-ছ ঘণ্টা পড়ে। পরীক্ষা থাকলে বা ছুটির সময় পড়াশোনার সময় কিছুটা বেড়ে যায়।

শ্রেয়া সময়সুযোগ পেলেই স্কুলের লাইব্রেরি ব্যবহার করে। বিভিন্ন বই পড়ে ও আদর্শ উত্তর তৈরির চেষ্টাও করে নিয়মিত। ওর প্রিয় বিষয় লাইফ-সায়েন্স। এই বিষয়ে দিদিরা দেখিয়ে দেন, এমন কী গ্রে-র অ্যানাটমি থেকে নোটসও লিখিয়ে দেন। শ্রেয়া পড়ে মেন্দা-মুখোপাধ্যায়, চক্রবর্তী-দাশগুপ্ত আর ডাঃ অমূল্যভূষণ চক্রবর্তীর বই। মাঝে মাঝে কুণ্ডু-দাশ-কুণ্ডু। তেমনি ফিজিক্যাল সায়েন্সে স্কুলের বই (বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, ডঃ অলক চক্রবর্তী) ছাড়া চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত এবং সমর গুহ-র বই।

অঙ্ক করে রোজই। স্কুলে কেশব নাগের বই, এছাড়া ও কে পি বসু এবং যাদব চক্রবর্তী ব্যবহার করে। টেস্ট-পেপার্সও।

"ভূগোল, ইতিহাস—এ-সব সাবজেক্টে কী কর? উত্তর লিখে তৈরি?"

"না। ভূগোলে ম্যাপ-পয়েন্টিংটা খুব বেশি করে করি। আমাদের সুদিন ভট্টাচার্যের বই পড়ানো হয়। তার সঙ্গে আমি পড়ি কমলাক্ষ চট্টোপাধ্যায়। তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রায় ও চক্রবর্তীর 'ভারত ও ভূমণ্ডল' বসু-ভট্টাচার্য—এসবও বেশি করে পড়ি। শিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের বইও মাঝে মাঝে দেখি। মানচিত্র অনুশীলনের জন্য আমাদের বুকলিস্টে চট্টোপাধ্যায় ও চট্টোপাধ্যায়ের 'ভূপরিচয়' দেওয়া আছে। খুব ভাল বই।"

ইতিহাসে স্কুলের বই দুটি (ডঃ গোপাল রায়চৌধুরী, ডঃ অমিতাভ মুখোপাধ্যায় ও ডঃ প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায়) শ্রেয়া ভাল করেই পড়ে। কিন্তু কিরণ চৌধুরী ও অতুল রায়ের বই দুটি বাদ দিয়ে ইতিহাস পড়ার কথা ও ভাবতেই পারে না।

সংস্কৃতে টেক্সট-এর উপর গ্রামার, ছোট ছোট প্রশ্ন, ব্যাকরণগত টীকা, ব্যাখ্যা এগুলি ভাল করে তৈরি করে শ্রেয়া। বাইরের অংশের জন্যে ব্যবহার করে সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণ কৌমুদী আর সুবিখ্যাত 'হেল্পস্ টু দি স্টাডি'। স্কুলে পড়ানো হয় দুর্গাচরণ সাংখ্যতীর্থ সম্পাদিত ব্যাকরণ কৌমুদী আর হৃষীকেশ শাস্ত্রীর গ্রামার কম্পোজিশনের বই।

শ্রেয়া বাংলা এবং ইংরেজী একই পদ্ধতিতে পড়ে। টেক্সটা ভাল করে পড়ে নেয়। শক্ত শব্দগুলির অর্থ অভিধান থেকে দেখে। তারপর যে-সব প্রশ্ন আসতে পারে সেগুলো লিখে তৈরি করে এবং শেখে।

মাসিক আনন্দমেলার এই গ্রাহিকাটি এই পত্রিকার "লেখাপড়া" বিভাগটি খুব ভালবাসে। বলল, "ওতে অনেক নতুন নতুন বইয়ের নাম জানা যায়। সেগুলো তখন দেখি।"

রঞ্জিতকুমার ঘোষ

ফোটো/তপন দাশ

(একত্রিশের পাতার পর)

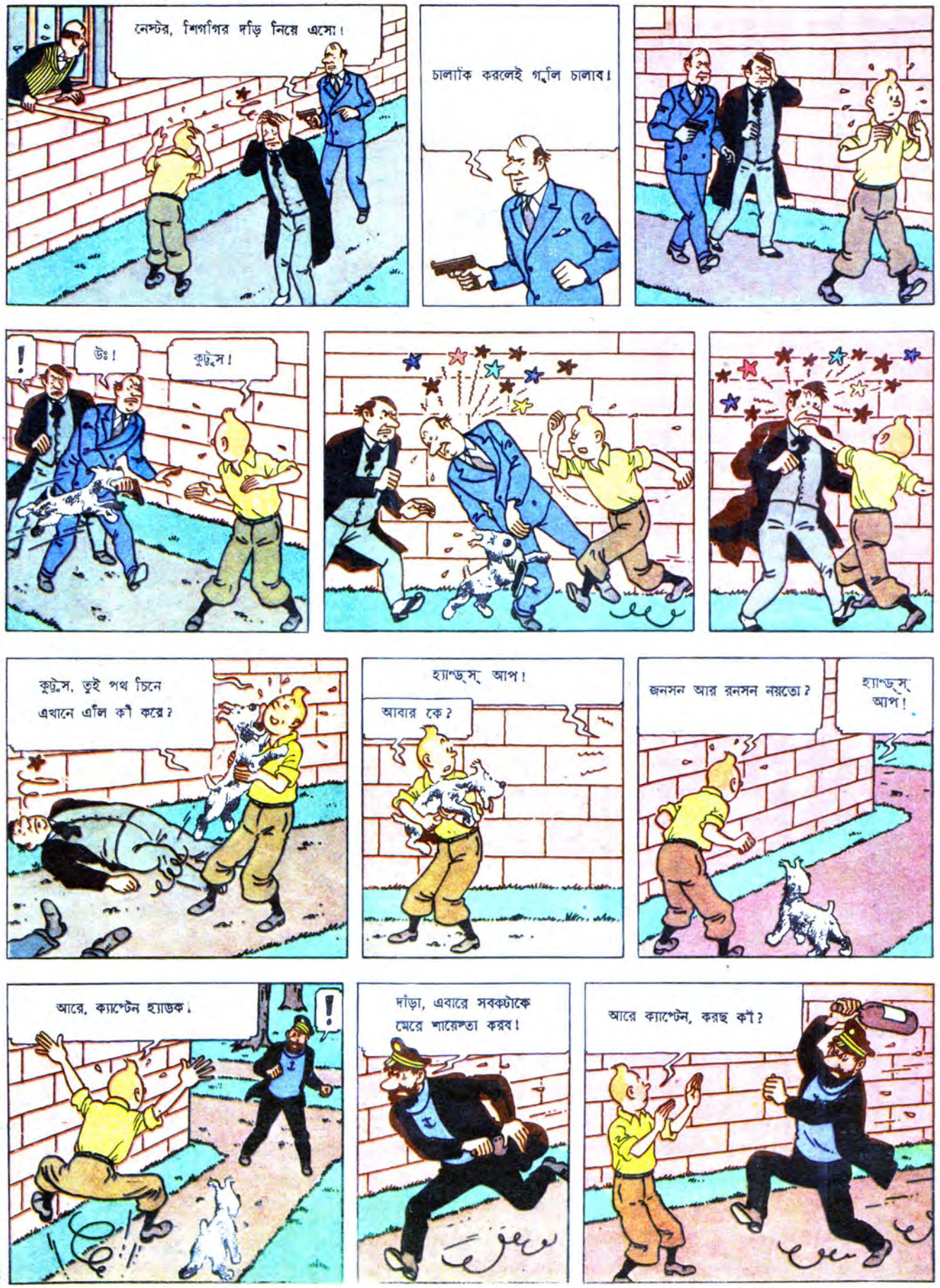

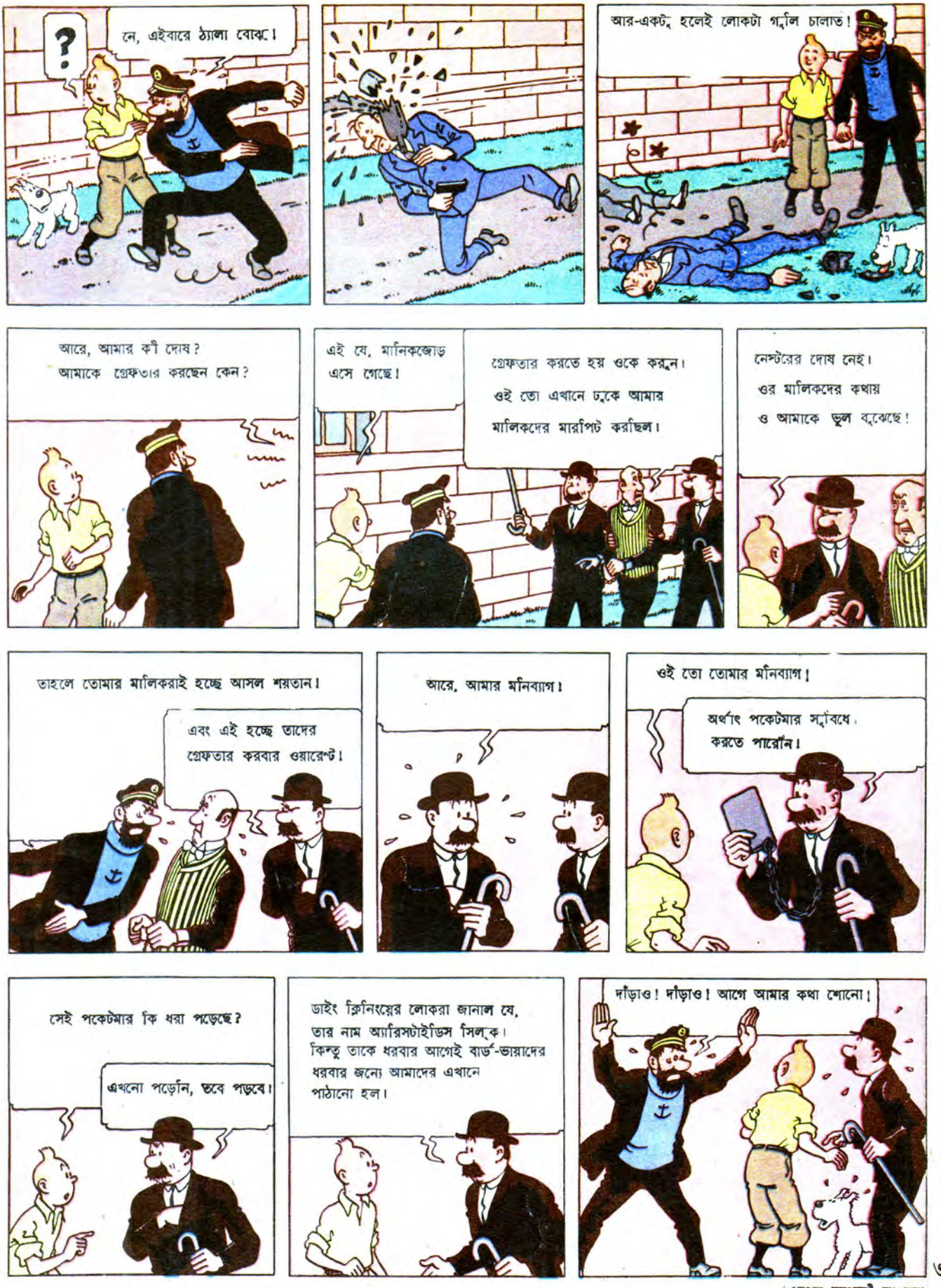

(এরপর আগামী সংখ্যায়)

উপন্যাস

বন্ধ ঘরের আওয়াজ

সমরেশ বসু

আগে যা ঘটেছে

গোগোল ইস্কুল থেকে বাড়ি ফিরে শুনল, সাততলার ডাবুদা গতকাল সেই যে ইস্কুলে বেরিয়েছিল, এখনও ফেরেনি। ডাবুদার ভাল নাম নবনীত। গোগোল সবে দশে পড়েছে। সব শুনে সে ভাবতে লাগল ডাবুদার কী হতে পারে। মা গোগোলকে সাবধান করে দিলেন, ও যেন এই ফ্ল্যাটবাড়ির নীচের চত্বর ছেড়ে কোথাও না যায়। খাওয়া শেষ হবার আগেই ডাবুদার বাবার সঙ্গে দুজন পুলিস অফিসার গাড়ি নিয়ে এলেন। গোগোলের খাওয়া মাথায় উঠে গেল। লিফটে চেপে উপরে উঠতে গিয়ে দেখল, লিফট নীচে নেমে আসছে। লিফট না থেমে নেমে গেল, আর লিফটের খাঁচার ভেতরের লোকটাকে গোগোল চিনতে পারল না। গোগোল এক পলকেই দেখে নিয়েছে, লোকটার একজোড়া গোঁফ আর চোখ দুটো জ্বলজ্বলে। মনে হল মোটর ড্রাইভারের মতো। অথচ চিনতে পারল না। লিফটে চড়ার আশা নেই দেখে, গোগোল সিঁড়ি ভেঙেই সাততলায় উঠল। ডাবুদাদের বাইরের ঘরে দেখল দুজন পুলিস অফিসার, ডাবুদার বাবা আর মা বসে আছেন। মীনাদি আর রিনাদি খাবার ঘরের দরজার কাছে কাঁদছেন। সমস্ত রকম অনুসন্ধান চালিয়েও নাকি ডাবুদার কোনো খোঁজ মেলেনি। আশেপাশের সন্দেহজনক কয়েকজন লোককে পুলিস জিজ্ঞাসাবাদ করেছে, গোয়েন্দারা নাকি নজর রাখছে, আর ভারতবর্ষের সব বড় বড় শহরে, রেল স্টেশনে, ডাবুদার হারিয়ে যাবার খবর জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। গোগোল এই সব সংবাদ নীচে বন্ধুদের দেবার জন্য সিঁড়ি দিয়ে ছুটে নামতে গিয়ে, ছতলার সিন্ধি পরিবার মহেশানিদের ফ্ল্যাটের বন্ধ দরজার ভেতরে যেন কার চাপা গলা শুনতে পেল, 'এই, চুপ!'

৩

গোগোল ছতলায় মহেশানিদের বন্ধ দরজার সামনে এক মুহূর্ত দাঁড়িয়েই লাফাতে লাফাতে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে নীচের চত্বরে নেমে এল। বাবার সঙ্গে ডাবুদাদের ফ্ল্যাটে দেখা হয়ে যাওয়ায় মনটা একটু খচ্‌খচ্‌ করছিল। বাবা রেগে গেলেন কি না কে জানে। কিন্তু নীচের চত্বরে বন্ধুদের দেখে, বাবার কথাটা এখনকার মতো বেমালুম ভুলে গেল। ওর বন্ধুরা পুলিসের ওয়্যারলেস-লাগানো লাল রঙের জীপটার দিকেই তাকিয়ে দেখছিল। জীপের ভিতরে ড্রাইভারের আসনে, খাকি হাফ প্যাণ্ট আর হাফ শার্ট পরা একটি লোক বসে ছিল, যার নাক বোঁচা, চোখ দুটো নরুন-চেরা, আর লালচে মুখটা শক্ত। দেখে মনে হয় নেপালী। তার মুখটা এমন রাগী দেখাচ্ছে, জীপটার সামনে যেতেই সাহস হয় না। গোগোলের বন্ধুরা—সুমিত টুকাই গোগে জর্জ পারভেজ, সবাই দূর থেকেই জীপটাকে দেখছিল। কিন্তু গোগোলের মনে হল নেপালী পুলিস-ড্রাইভারটি বেশ নিরীহ।

চত্বরের এক পাশে একটা ছোট বাগান। সেখানে অন্যান্য ফ্ল্যাটের কয়েকজন, মীনাদি-রিনাদির মতো মেয়ে আর মহিলারা বসে, গম্ভীর মুখে কিছু বলাবলি করছেন। নিশ্চয়ই ডাবুদার বিষয়েই কথা হচ্ছে। বিভিন্ন ফ্ল্যাটে কাজ করে, এরকম কয়েকজন গেটের কাছে দাঁড়িয়ে জটলা করছে। গোগোল বুঝতে পারল, তারাও নিশ্চয় ডাবুদার বিষয়েই আলোচনা করছে। বাইরের রাস্তা থেকে কেউ কেউ চত্বরের দিকে, যেন ভয়ে-ভয়ে উঁকি দিয়ে দেখছিল। আসলে পুলিসের জীপটাকে দেখছে। পাড়ায়ও এতক্ষণে নিশ্চয়ই ডাবুদার হারিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গিয়েছে। সামনের চত্বরে পুলিসের জীপ আর ডাবুদাদের গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। সচরাচর সামনের চত্বরে গাড়ি দাঁড় করাবার নিয়ম নেই। গাড়ি পার্কিংয়ের খোলা আর ঢাকা জায়গা আছে। সেখানে কয়েকটা গাড়িও রয়েছে। চত্বরটা জুড়ে এ-সময়ে গোগোলদের, আর গোগোলদের থেকেও ছোট ছেলেমেয়েদের খেলা শুরু হয়ে যায়। আজ সবই অন্যরকম। একটা ঘটনায়, বিরাট আর উঁচু গোটা ফ্ল্যাটবাড়িটাই যেন কেমন থম্‌থম্‌ করছে।

জর্জ প্রথম গোগোলকে দেখতে পেয়ে ডেকে উঠল, "গোগোল!"

জর্জের ডাকে অন্যরাও গোগোলের দিকে তাকাল। গোগোল বন্ধুদের দিকে এগিয়ে গেল। বন্ধুরাও ওর দিকে এগিয়ে এল। টুকাই বলল, "ইস্কুল থেকে তো অনেকক্ষণ এসেছিস। এতক্ষণ বাড়িতে কী করছিলি?"

জর্জের মুখের মাপের তুলনায় ওর নতুন ওঠা দাঁতগুলো রীতিমতো বড় দেখায়। ও বড় বড় আর ঝকঝকে দাঁত দেখিয়ে হেসে বলল, "ওর মাম্‌মি ওকে বেরোতে দিচ্ছিল না। তাই না রে গোগোল?"

জর্জ অ্যাংলোইণ্ডিয়ান হলেও, খুব ভাল বাংলা বলতে পারে। ওর মা বাবা আর দিদি বিশেষ পারেন না। ছোট বোন লিজা জর্জের মতোই বাংলা বলতে পারে। কিন্তু কোন-কোন সময় জর্জের কথা শুনলে, গোগোল রাগ না করে পারে না। জর্জ প্রায়ই চিপটেন কেটে কথা বলে, আর পেছনে লাগে। যদিও ও আসলে ঠাট্টা করে বলে, তবু রাগ হয়ে যায়। যেমন এখন কথাটা বলল। গোগোল দাঁতের ফাঁক দিয়ে বলল, "কে বলেছে তোকে, মা আমাকে বেরোতে দিচ্ছিল না?"

জর্জ ওর কালো ঝকঝকে চোখে অন্য বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে হাসল। বলল, "তবে তুই এতক্ষণ আসিসনি কেন? আমরা তোর কথা বলছিলাম। তুই ঘরে বসে কী করছিলি?"

গোগোল বেশ ঝাঁঝিয়ে বলল, "আমি মোটেই আমাদের ঘরে ছিলাম না। আমি ডাবুদাদের ফ্ল্যাটে গেছলাম, সেখান থেকেই আসছি।"

গোগোলের কথা শুনে, বন্ধুরা সকলেই বেশ কিছুটা হক-চকিয়ে গেল, আর সকলের চোখেমুখেই কৌতূহল ফুটে উঠল। সুমিত যেন বিশ্বাস করতে পারল না, এমনভাবে জিজ্ঞেস করল, "এখন তুই ডাবুদের ফ্ল্যাট থেকে এলি?"

পারভেজ বলল, "ডাবুদের ফ্ল্যাটে তো এখন পুলিস অফিসাররা রয়েছে! তুই গেলি কী করে?"

গোগোল বলল, "কেমন করে আবার, যেমন করে সবাই যায়। আমি ডাবুদাদের বসবার ঘরের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম, আর একজন পুলিস অফিসার আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, কী চাই খোকা? তারপরেই আমাকে মীনাদি আর রিনাদি ভেতরে ডেকে নিলেন।"

বন্ধুরা সকলেই কেবল হতবাক্‌ হয়ে গেল না, গোগোলের দিকে সবাই এমনভাবে তাকাল, যেন ও একটা বিরাট কাণ্ড করে এসেছে! ওদের চোখে গোগোল এখন প্রায় টারজানের মতোই হিরো! গোগে চোখ বড় করে জিজ্ঞেস করল, "মীনাদি রিনাদি

তোকে কী বলল?"

জর্জ গোগোলের হাত টেনে ধরে, অন্য পাশে সরিয়ে নিয়ে যেতে যেতে বলল, "চল্ গোগোল, আমরা সিঁড়ির ওপরে বসে কথা বলি।"

গোগোল সকলের সঙ্গে, লিফটের বারান্দার নীচে সিঁড়ির এক পাশে জড় হয়ে বসল। গোগোল প্রথমেই গোগের কথার জবাব দিল, "মীনাদি-রিনাদি আর কী বলবেন? কেঁদে-কেঁদে ওঁদের চোখ লাল হয়ে গেছে। আমাকে বললেন, ডাবুদার কোনো খোঁজই পাওয়া যায়নি। আর ডাবুদার মাও খুব কাঁদছেন। ডাবুদার বাবার চোখ দেখে আমার মনে হল, তিনিও কেঁদেছেন।"

সকলের মুখই খুব গম্ভীর হয়ে উঠল। জর্জ জিজ্ঞেস করল, "পুলিস-অফিসাররা কিছু বলল না?"

গোগোল বলল, "কী আর বলবেন? ডাবুদাকে তাঁরা কোথাও খুঁজে পাননি। আসলে ডাবুদা নাকি কাল ইস্কুলেই যায়নি। তার মানে হল, কাল ইস্কুলে যাবার সময়েই ডাবুদার একটা কিছু ঘটে গেছে।"

টুকাই জিজ্ঞেস করল, "ডাবুদা যে কাল ইস্কুলে যায়নি, কী করে জানা গেল?"

গোগোল বলল, "কী করে আবার? পুলিস আর ডাবুদার বাবা ইস্কুলে গিয়ে জেনেছেন।"

জর্জ বলল, "পুলিসের লোক সব বোগাস্।"

সুমিত জিজ্ঞেস করল, "কেন?"

জর্জ বলল, "কেন আবার? আজকাল খবরের কাগজে কত ছেলের হারিয়ে যাবার খবর বেরোচ্ছে। পুলিস তো তেমন কিছুই করতে পারছে না। ডাবুদা কি একটা দু-তিন বছরের বাচ্চা ছেলে, যে ছেলেধরা বস্তায় পুরে নিয়ে যাবে? এর মধ্যে শিওর অন্য-কিছু আছে।"

গোগোল জিজ্ঞেস করল, "কী থাকতে পারে?"

গোগোলের সঙ্গে সবাই জর্জের দিকে ঝুঁকে পড়ল। জর্জ যেন বিপদে পড়ে গেল, অথচ ওর মুখে চিন্তার ছায়া। তবু কী যে জবাব দেবে, কিছুই ঠিক করে উঠতে না পেরে, হাত ঘুরিয়ে বলল, "কী থাকতে পারে, তা আমি কী জানি? আমি বলছি, ডাবুদার মতো ছেলেকে কেউ দিনের বেলা রাস্তা থেকে চুরি করে নিয়ে যেতে পারে না। পারে কি? তোরাই বল্ না।"

সকলেই মুখ চাওয়াচাওয়ি করল, চট করে কেউ কোনো জবাব দিতে পারল না। গোগোল আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে বলল, "সেটা তো খুবই ঠিক কথা। কিন্তু তুই যে বললি, এর মধ্যে শিওর অন্য কিছু আছে, তার মানে কী? কী থাকতে পারে?"

জর্জ একই সঙ্গে খুবই অবাক হয়ে উঠল, আর বিরক্তও। বলল, "তা আমি জানব কী করে? আমার যা মনে হল, তাই

শিশুদের—
কিশোরদের—
যত ছোটদের
বই

বল্‌গাহীন কৌতুক-কল্পনার রাজা 'ঘনাদা' প্রেমেন্দ্র মিত্রের এক আশ্চর্য সৃষ্টি। সারা বাংলা সাহিত্যে তার আর জুড়ী নেই। তার কীর্তিকাহিনীগুলি যতবারই পড়ি না কেন, কখনও যেন পুরোনো হয় না। প্রতিবারই মনে হয় নতুন—সমান বর্ণোজ্জ্বল, সমান আকর্ষক। সেইরকম চিরনতুন কয়েকটি কাহিনীর সংকলন ঃ

আগ্রা যখন টলমল ৫·০০
যাঁর নাম ঘনাদা ৫·০০

শিবরাম চক্রবর্তী
হর্ষবর্ধন নিত্যনূতন ৪·০০
শিব্রামের বারো আড়ি ৫·০০
দিগ্বিজয়ী হর্ষবর্ধন ৫·০০
এক মেয়ে ব্যোমকেশের কাহিনী ৬·০০
বিমল কর
ওআণ্ডার মামা ৬·০০
কাপালিকরা এখনও আছে ৭·০০
গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু ও ময়ূখ চৌধুরী
নিশীথ রাতের আহ্বান ৩·০০
গৌরকিশোর ঘোষ
দুপুর দুপুর ৩·০০
আনন্দ বাগচী
বনের খাঁচায় ৫·০০
পার্থসারথি চক্রবর্তী
কেমিক্যাল ম্যাজিক ৪·০০
চিকিৎসাবিজ্ঞানের আজব কথা ৪·০০
রসায়নের ভেল্‌কি ৩·০০
ম্যাজিকের মত মজা ৫·০০
মৌমাছি (বিমল ঘোষ)
রাজার রাজা ৭·০০
শৈলেন ঘোষ
অরুণ বরুণ কিরণমালা ৩·০০
মিতুল নামে পুতুলটি ৪·০০
ছোট্ট সোনার গল্প শোনা ৬·০০
বাজনা ৫·০০
হুপ্পোকে নিয়ে গপ্পো ৫·০০
আমার নাম টায়রা ৫·০০
শঙ্করীপ্রসাদ বসু
আমাদের নিবেদিতা ৬·০০
পাপু (সুব্রত সরকার)
পাপুর ছবি সঙ্গে ছড়া ৫·০০
পাপুর বই ৬·০০
হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়
ভয়ের মুখোশ ৫·০০
পাথরের চোখ ৬·০০
সীমানা ছাড়িয়ে ৬·০০
পাঁচমুণ্ডীর আসর ৬·০০
শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
ভূমিকম্পের পটভূমি ৪·০০
ইন্দ্রমিত্র
বিদ্যাসাগরের ছেলেবেলা ৫·০০
শরৎ কথামালা ১০·০০
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
ভয়ংকর সুন্দর ৪·০০
সাঁত্যি রাজপুত্র ৫·০০
তিন নম্বর চোখ ৫·০০
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
ঘণ্টাদার কাবলু কাকা ৫·০০
অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ এবং ৬·০০
তপন চরিত ৫·০০
প্রীতি নন্দী
ননীদা নট আউট ৪·০০
স্ট্রাইকার ৬·০০
স্টপার ১০·০০
কোনি ৬·০০
সমরজিৎ কর
একটি সংকেতের জন্যে ৬·০০
নারায়ণ চক্রবর্তী
হলদে সবুজ ফুস্‌ট্যাল ১৩·০০
পূর্ণেন্দু পত্রী
কী করে কলকাতা হলো ৪·০০
ছড়ায় মোড়া কলকাতা ৪·০০
বুদ্ধদেব গুহ
ঝজুদার সঙ্গে জঙ্গলে ৫·০০
ঝাঁকিদর্শন ৬·০০
সুকুমার রায়
সমগ্র শিশুসাহিত্য ১০·০০
সুকুমার সাহিত্যসমগ্র (১ম) ২৫·০০
সুকুমার সাহিত্যসমগ্র (২য়) ৩০·০০
জীবজন্তু ৮·০০
সত্যজিৎ রায়
বাদশাহী আংটি ৫·০০
এক ডজন গপ্‌পো ১০·০০
প্রোফেসর শঙ্কুর কাণ্ডকারখানা ৫·০০
গ্যাংটকে গণ্ডগোল ৫·০০
সোনার কেল্লা ৬·০০
বাক্স-রহস্য ৫·০০
কৈলাসে কেলেঙ্কারি ৫·০০
সাবাস প্রোফেসর শঙ্কু ৬·০০
রয়েল বেঙ্গল রহস্য ৫·০০
আরো এক ডজন ১০·০০
জয় বাবা ফেলুনাথ ৬·০০
ফটিকচাঁদ ৮·০০
ফেলুদা এণ্ড কোং ৮·০০
সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার
ছেলেদের বিবেকানন্দ ২·০০
সরলাবালা সরকার
পিনকুর ডাইরি ৪·০০
মনোজ বসু
ওস্তাদ নটবর ৬·০০
শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়
ক্লাস সেভেনের মিস্টার ব্রেক ৪·০০
লীলা মজুমদার
বাতাসবাড়ি ৪·০০
অমরনাথ রায়
দেশবিদেশের বিজ্ঞানী ১০·০০
আশাপূর্ণা দেবী
রাজকুমারের পোশাকে ৪·০০
সমরেশ বসু
মোক্তারদাদুর কেতুবধ ৫·০০
অমিতাভ চৌধুরী
তেপান্তরের মাঠে ৩·০০
ননীগোপাল চক্রবর্তী
চরকা বুড়ী ৪·০০
গিরিবারী কুণ্ডু
টংসা চু ৫·০০
সুবোধ ঘোষ
সেই অদ্ভুত অস্ত্রখানি ৫·০০
বিমল মিত্র
রাজা হওয়ার ঝকমারি ৭·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন।
কলকাতা-৭০০০০৯ ফোন ৩৪-৪০৬২

বললাম। আমি কি পুলিস? ডাবুদা বাড়ি থেকে বেরিয়ে ইস্কুলে গেল, কেমন? কিন্তু ইস্কুলে যায়নি, কোথায় গেছে কেউ জানে না। আর পুলিস খালি খুঁজে বেরাচ্ছে, এরকম খবর তো প্রায়ই কাগজে বেরোয়। আমি তাই বলছি, ডাবুদাকে কেউ জোর করে চুরি করে নিয়ে যায়নি, শিওর অন্য কিছু আছে।"

আবার সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করল, হঠাৎ কেউ কিছু বলল না। গোগোল বলল, "আমি শুনে এলাম, পুলিস অফিসার বলছিলেন, যা ঘটবার তা ডাবুদার ইস্কুলে যাবার পথেই ঘটেছে। আশেপাশের সন্দেহজনক লোকদের ওপর গোয়েন্দারা নাকি নজর রাখছে। আর ডাবুদা তার চেয়ে বয়সে বড়, পাড়ার যে-সব বাজে ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশা করত, পুলিস তাদের দুজনকে থানায় ধরে নিয়ে গিয়ে অনেক কথা জিজ্ঞেস করেছে, কোন ফল পাওয়া যায়নি। তারা কেবল বলেছে, ডাবুদার পয়সায় রেস্টু-রেন্টে খেত, আর কিছুই জানে না।"

টুকাই বলে উঠল, "সে দুজন নিশ্চয়ই পিলু আর জ্যাকি, যারা সব সময় আমাদের এই রাস্তার মোড়ে ব্যান্ডমাস্টারের রকে আড্ডা দেয়? ওদের সঙ্গে ডাবুদাকে আমি অনেকদিন হেসে-হেসে কথা বলতে দেখেছি।"

পিলু আর জ্যাকিকে পাড়ার সবাই চেনে। তাদের বয়স কম করে আঠারো কুড়ি তো বটেই। তার বেশিও হতে পারে। পিলু এ-পাড়ার ভদ্র বাড়ির ছেলে। তার বাবা কোন এক অফিসে চাকরি করেন, আর তার এক দিদিও কোথায় চাকরি করেন। অন্যান্য ভাই-বোনেরাও ভাল, লেখাপড়া করে, ইস্কুলে যায়। কিন্তু পিলু লেখাপড়া করে না। গোগোলরা কখনো তাকে ইস্কুলে-কলেজে যেতে দেখেনি। তার চালচলন কথাবার্তাই আলাদা। পাড়ার বড়দের সে মোটেই সমীহ বা শ্রদ্ধা করে না। সিগারেট তো সবাইকে দেখিয়ে যখন তখনই খায়। তার বন্ধু জ্যাকি হল মুসলমান। মার্কেটের ভিতরে তার বাবার আলু-পেঁয়াজের দোকান আছে। কিন্তু জ্যাকি সেখানে কখনো বসে না। মার্কেটের পিছন দিকে একটা বস্তিতে জ্যাকিদের বাসা। জ্যাকির বাবা একজন সামান্য দোকানদার হলেও লোক খুব ভাল। অথচ জ্যাকি লেখা-পড়াও করে না; কোনো কাজও করে না। পিলু আর জ্যাকি, দুজনেই সমান।

গোগোলও অনেক দিনই ডাবুদাকে পিলু আর জ্যাকির সঙ্গে মিশতে দেখেছে। ব্যান্ডমাস্টারের রকে বসে কখনো ওদের সঙ্গে ডাবুদা আড্ডা দিত না। তার কোনো উপায়ও ছিল না। ডাবুদার বাবা বা মা-দিদিরা কেউ দেখতে পেলে, নিশ্চয়ই বকুনি খেত। কিংবা বাবা-মায়ের কাছে মার খেতেও পারত। কিন্তু গোগোল কয়েকবার ডাবুদাকে ব্যান্ডমাস্টারের ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখেছে। সঙ্গে পিলু আর জ্যাকি। অথচ নিরীহ আর আধবুড়ো ব্যান্ডমাস্টার লোকটিকে চুপচাপ বসেই থাকতে দেখা যায়। সে ওদের দিকে ফিরেও তাকায় না। কোন সময় কথাও বলতে দেখা যায় না। এর একটাই মাত্র কারণ, ব্যান্ডমাস্টার পিলু আর জ্যাকিকে নিশ্চয় ভয় পায়, ঘাঁটাতে সাহস পায় না।

ব্যান্ডমাস্টার মানে ব্যান্ডমাস্টার! তার দোকানের সামনেই, দরজার মাথার কাছে ঝোলানো আছে একটা মস্ত বড় পেতলের বিউগল পাইপ বাঁশি। দেখলেই মনে হয়, তালগোল পাকানো মস্ত একটা চোঙা। আসলে এটা একটা বাঁশি। ওটা অনেকদিনের পুরনো, কয়েক জায়গায় টোল খেয়ে গিয়েছে। কিন্তু ব্যান্ড-মাস্টার নিজের হাতে ওটা মেজে ঘষে ঝকঝকিয়ে ঝুলিয়ে রাখে। ওই পাইপ বাঁশিটাই তার দোকানের সাইনবোর্ড। বিয়ে বা কোনো উৎসবে কেউ যখন ব্যান্ডপার্টির খোঁজ করে, তারা ওই বাঁশিটা দেখলেই বুঝতে পারে। অবিশ্যি দোকানের টিনের দরজার গায়ে, আলকাতরা দিয়ে আঁকাবাঁকা অক্ষরে ইংরেজিতে লেখা আছে,

"এম কে ফারুক—ব্যান্ডমাস্টার।" কিন্তু লোকটিকে কেউ তার নাম ধরে ডাকে না। সবাই ব্যান্ডমাস্টার বলে।

গোগোল মনে-মনে অবাক হয়, কারণ ব্যান্ডমাস্টারের দোকান বলতে, রাস্তার ওপরে এক চিলতে একটা ফাঁকা ঘর মাত্র। ঘরের মধ্যে, ব্যান্ডপার্টির বাজনা বা পোশাক, কিছুই নেই। অথচ যখন কোথাও তার ডাক আসে, তখন দেখা যায়, অনেক বাজনদারেরা দোকানের সামনে হাজির। তাদের গায়ে বিচিত্র রঙের ইউনিফর্ম আর মাথায় টুপি। ব্যান্ডমাস্টারের পোশাকটা সব সময়েই আলাদা। তার পোশাকটা সব সময়েই গলাবন্ধ কালো কোট আর প্যান্ট। কালো কোটের দুই বুকে সাদা পাখি আঁকা, আর প্যান্টে সাদা ডোরা। দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে, ব্যান্ডমাস্টার তার লোক-দের নিয়ে অনেকক্ষণ মহড়া দেয়। তখন অনেকে সেখানে ভিড় করে। তারপরে তারা চলে যায় বিয়ে বা কোনো উৎসবের বাড়ি।

ব্যান্ডমাস্টার লোকটিকে গোগোলের খুব ভাল লাগে। মহড়ার সময়, পেতলের বিরাট পাইপ বাঁশিটা তার গলায় ঝোলে। মাঝে মাঝে বাজায়. আর মোটা গম্ভীর আশ্চর্য সুর বের হয়। ঠিক মনে হয়, যেন তৎক্ষণাৎ ভয়ংকর কিছু একটা ঘটবে। কেন গোগোলের এরকম মনে হয়, ও জানে না। লোকটির সঙ্গে ভাব করার বা কথা বলার ইচ্ছা থাকলেও সম্ভব নয়। লোকটা নিজেই কেমন নিরেট মুখে চুপচাপ বসে থাকে। গোগোল তার সঙ্গে কী কথা বলবে, ভেবে পায় না। অথচ কথা বলতে ইচ্ছা করে। কিন্তু কোনো দিন কথা বলতে দেখলে, বাবা যে রেগে যাবেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অবিশ্যি এটা ওর ধারণা। হয় তো বাবা রাগ নাও করতে পারেন। রাগ করার একটাই কারণ থাকতে পারে,

লোকটার দোকানের রকে পিলু আর জ্যাকিরা আড্ডা দেয়। ব্যাণ্ডমাস্টার কেন ওদের কিছু বলে না? তার চৌকো তাবিজ-ঝোলানো বুক বেশ চওড়া। হাত দুটোও বেশ শক্ত।

টুকাইয়ের কথাটা গোগোলের মনে ধরল। পুলিস অফিসার যে-দুজনকে ধরে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের কথা বলছিলেন, তারা নিশ্চয় পিলু আর জ্যাকিই হবে। ও বলল, "তুই ঠিক বলেছিস টুকাই, আমারও মনে হচ্ছে, পিলু আর জ্যাকিকেই পুলিস ধরে নিয়ে গেছল। ডাবুদাটা যে কেন ওদের সঙ্গে মিশত।"

পারভেজ বলল, "কেন আবার? ব্যাণ্ডমাস্টারের ঘরের ভেতরে, ডাবুদা ওদের সঙ্গে লুকিয়ে সিগারেট খেত। আমি নিজের চোখে দেখেছি।"

জর্জ বলল, "কিন্তু আমি বাড়ি থেকে তোদের এখানে আসবার সময় দেখলাম, পিলু আর জ্যাকি পাশীদের বাড়ির গ্যারেজের এক কোণে বসে আছে।"

গোগোল বলল, "তা থাকতে পারে। পুলিস তো ওদের কথাবার্তা জিজ্ঞেস করে ছেড়ে দিয়েছে।"

গোগে বলল, "এটা তো আন্দাজের কথা। পুলিস পিলু জ্যাকিকে নাও ধরতে পারে।"

জর্জ বলল, "তা ঠিক। ওরা ছাড়াও ডাবুদা আরো অনেক আজেবাজে বড়দের সঙ্গে মেশে, আমি দেখেছি।" বলে ও গোগোলের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, "পুলিস অফিসাররা আর কী বলল?"

গোগোল জবাব দিল, "বললেন, হোল ইণ্ডিয়ার সব বড়-বড় শহরে স্টেশনে ডাবুদার খবর দিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু জানিস, হনুমন্তিয়াজী একটা অদ্ভুত কথা বলছিলেন।"

সবাই গোগোলের দিকে ঝুঁকে এল। গোগোলের হঠাৎ মনে হল, ওর প্যান্টের পকেটে কিছু যেন চট্‌চট্‌ করছে। মনে পড়ে গেল, প্যান্টের পকেটে মাখন লাগানো টোস্ট রয়েছে। ও তাড়া-তাড়ি পকেট থেকে রুটির টুকরোটা বের করল। মাখন গলে সেটা ভিজে ন্যাতা হয়ে গিয়েছে। সবাই অবাক হয়ে ব্যাপার জিজ্ঞেস করল। গোগোল হাসতে-হাসতে ঘটনাটা বলল. আর রুটির টুকরোটা জর্জের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "খাবি?"

জর্জ এমনিতে খুব হাসি মজা করতে পারে। এখন খুব লজ্জা পেয়ে বলল, "না না, আমি খাব না। তুই খা।"

গোগোল জোর করেই রুটির টুকরোটা জর্জের হাতে গুঁজে দিয়ে বলল, "এটা তোকেই খেতে হবে।" এটা শুধু জর্জকে ভাল-বাসার জন্য না। আসলে জর্জের জন্য ওর মনে একটা কষ্ট আছে, সে-কথা ও কারোকে বলতে চায় না। জর্জের বাবা নেই, দিদি ছাড়া কেউ চাকরি করে না। ওরা ছ'ভাইবোন। কিন্তু জর্জ কখনো মুখ ফুটে ওদের সংসারের দুঃখের কথা বলে না। গোগোল ওর হাতে রুটিটা গুঁজে দিয়েই, ডাবুদার বিষয়ে হনুমন্তিয়াজীর কথা বলতে আরম্ভ করল, "উনি বলেছেন, হয়তো ডাবুদাকে কোনো বদমাইস লোক ভুলিয়ে-ভালিয়ে কোথাও নিয়ে গেছে, এবার ডাবুদার বাবার কাছে অনেক টাকা চেয়ে পাঠাবে। না পেলে হয়তো ডাবুদাকে মেরে ফেলবে!"

সবাই স্তম্ভিত হয়ে গেল। এ সময়েই লিফট নেমে এল, আর লিফট থেকে বেরিয়ে এলেন পুলিস অফিসার দুজন, আর ডাবুদার বাবা। গোগোল ভাবল, একবার জিজ্ঞেস করে, ওঁরা পিলু আর জ্যাকিকে ধরে নিয়ে গিয়েছিলেন কি না। কিন্তু সাহস পেল না। ওঁরা তিন জনেই চত্বরে নেমে গেলেন। জীপে উঠতেই অফিসারদের নিয়ে জীপ চলে গেল। ডাবুদার বাবাও তাঁর গাড়ি চালিয়ে পিছনে-পিছনে গেলেন।

গোগোল চত্বরের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে যাচ্ছিল। তখনই সেই লোকটাকে আবার চোখে পড়ল। সেই তিতুদার মতো গোঁফওয়ালা, কিন্তু ময়লা স্যাণ্ডেল পরা সাধারণ পোশাকের লোকটি। তার চোখ দুটো অদ্ভুত জ্বলজ্বলে। সে চারিদিকে দেখতে দেখতে সিঁড়ি দিয়ে বারান্দায় উঠে প্রায় দৌড়ে গিয়ে লিফটে উঠল। খাঁচার দরজা বন্ধ করে, বোতাম টিপতেই লিফট উঠতে আরম্ভ করল। গোগোল লিফটের দরজার মাথায় নীল আলোয় জ্বলে ওঠা ফ্লোর নাম্বার দেখতে লাগল, ওয়ান-টু-থ্রি-ফোর-ফাইভ-সিকস-সেভেন। তার মানে, লোকটা এ বাড়ির সব থেকে উঁচু আটতলায় গেল?

জর্জ জিজ্ঞেস করল, "এই গোগোল, তুই ওদিকে কী দেখছিস রে?"

আশ্চর্য! এই সময়েই একটা কথা মনে পড়ে যেতেই, গোগোলের মাথায় যেন বাজ ভেঙে পড়ল, আর গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। ওর হঠাৎ মনে পড়ে গেল, ছ'তলায় মহেশানি পরিবারের কেউ তো ফ্ল্যাটে নেই। গত সপ্তাহে দিল্লিতে কার মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে ওঁরা সবাই সপরিবারে দিল্লি চলে গিয়েছেন। তা হলে ফ্ল্যাটের ভিতরে কার চুপিচুপি স্বর শোনা যাচ্ছিল?

(ক্রমশ)

ছবি/সমীর সরকার

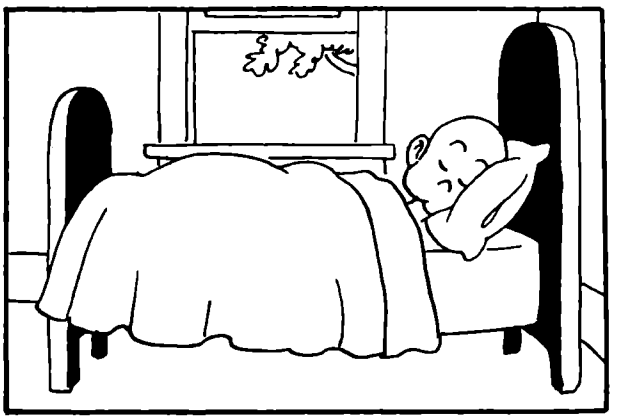

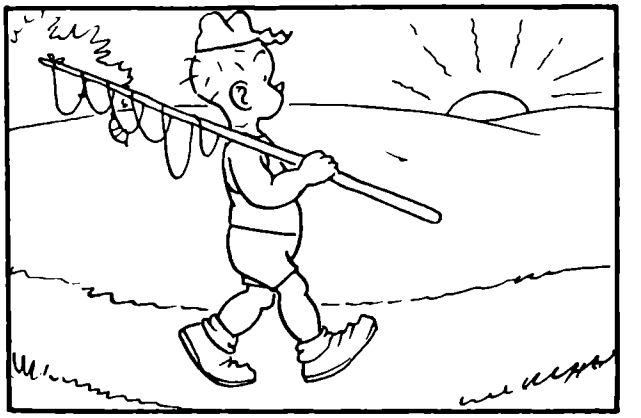

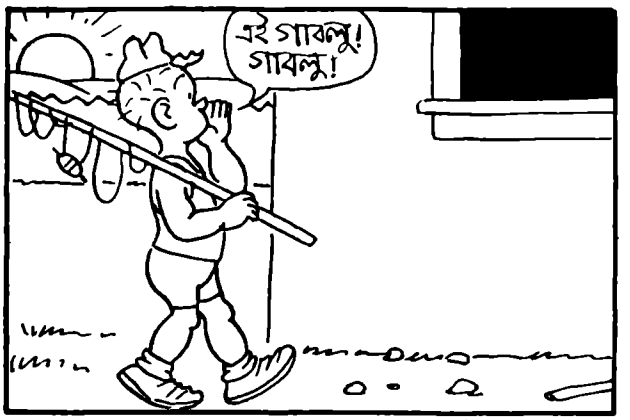
এই গাবলু!
গাবলু!

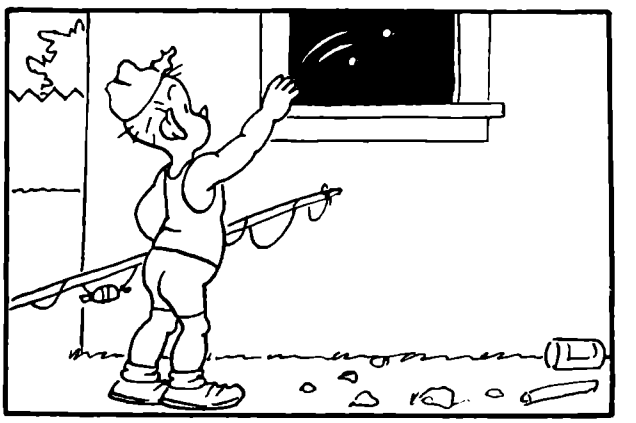

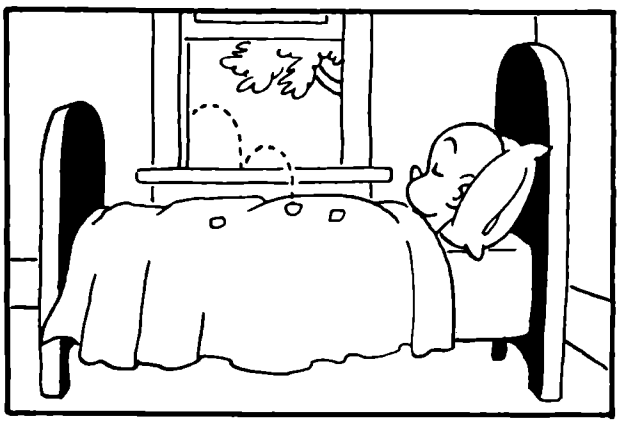

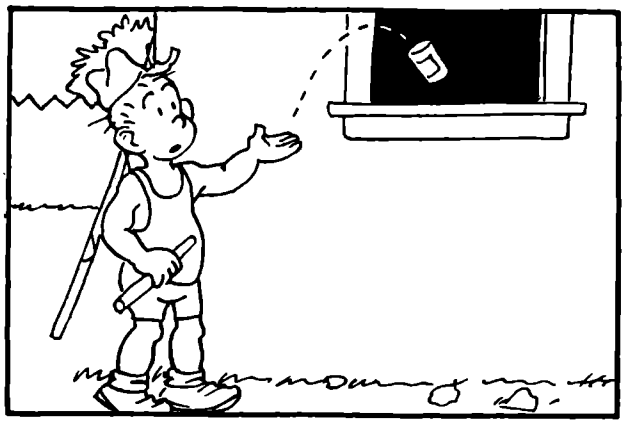

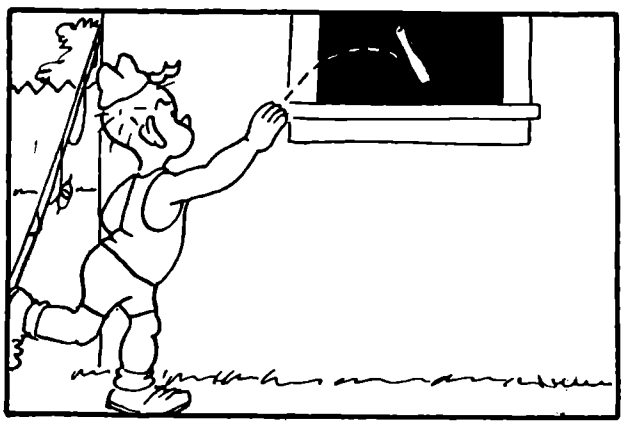

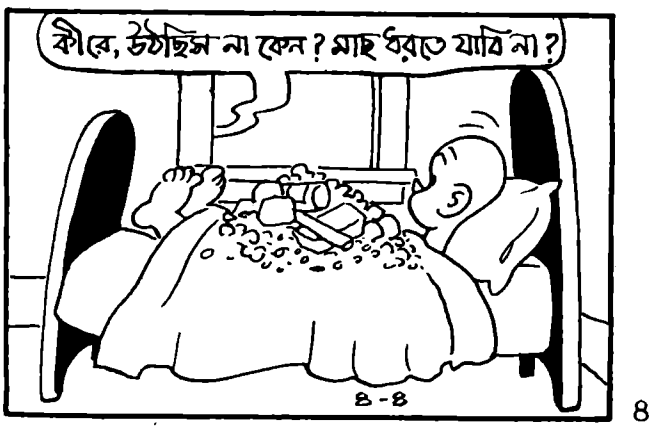
কীরে, উঠছিস না কেন? মাছ ধরতে যাবি না?

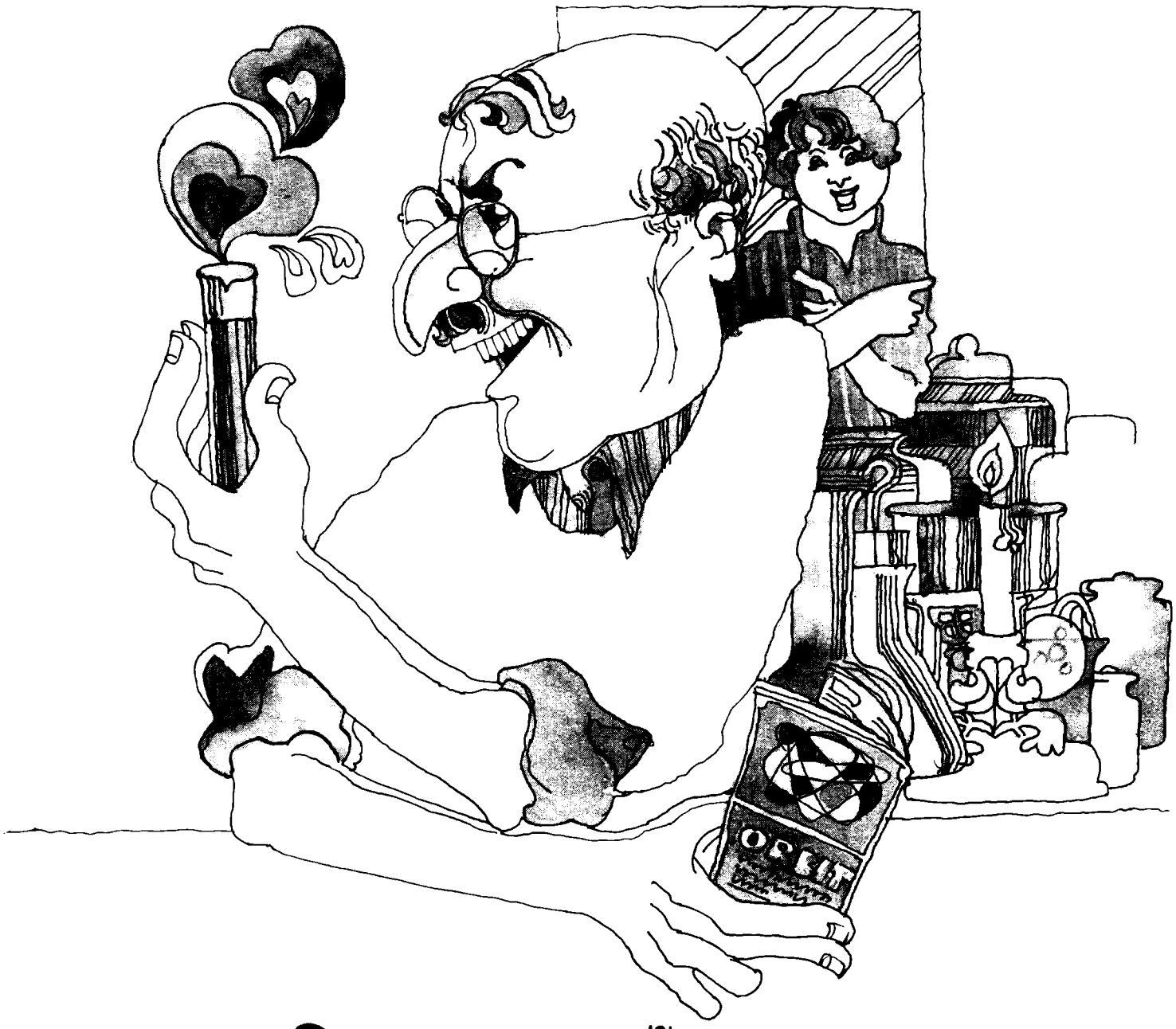

চিরঞ্জীব স্যার আর চাঁদের পাথর

শিশিরকুমার মজুমদার

আমার পিসতুতো ভাই বনপাহাড়ীতে থাকে। পড়ে আমার থেকে দু ক্লাস নীচে। তাহলেও আমার খুব বন্ধু। ছুটিতে ও কলকাতায় এলেই আমাদের সময়টা কাটে বেশ মজাসে। বনপাহাড়ীও যে কলকাতা থেকে কোন কোন বিষয়ে ভাল, তা কিন্তু ও আমাকে ভীষণভাবে বোঝাতে চেষ্টা করে। বনপাহাড়ীতে পাহাড় আছে, কলকাতায় নেই। বনপাহাড়ীতে জঙ্গল আছে, কলকাতায় নেই। তাছাড়া বনপাহাড়ী স্কুলের বিজ্ঞানের স্যার চিরঞ্জীববাবু নাকি মস্ত বৈজ্ঞানিক। তিনি নাকি কবেই চাঁদে গিয়েছিলেন! শুধু কি তাই, দুবস্তা চাঁদের পাথর এনে ডাঁই করে রেখেছেন তাঁর ঘরে, কী সব এক্সপেরিমেন্ট করবেন বলে।

সন্তু বিজ্ঞানের ব-ও জানে না। ওর মুখে এসব কথা শুনে আমি বিশ্বাস করতাম না। যখন বলতাম, "কই, খবর কাগজে তো তোদের স্যারের কথা বার হয়নি," তখন ও উত্তরে বলত, "তাই তো স্যার আমাদের দেশী কাগজওয়ালাদের দুচক্ষে দেখতে পারেন না। আমার কথা বিশ্বাস না হলে চলে এসো না বনপাহাড়ী। চাঁদের পাথর নিজের চোখেই দেখবে।"

পরীক্ষা হয়ে যেতেই বাবাকে বলে-কয়ে একদিন বনপাহাড়ীর ট্রেনে চেপে বসলাম।

স্টেশনে নেমেই সন্তুকে জিজ্ঞেস করলাম, "তোদের চিরঞ্জীব স্যার কোথায় থাকেন রে? একদিন দেখা করব।"

সন্তু গম্ভীর হয়ে বলল, "রাত জেগে ট্রেনে এসেছ, এখন খাওয়া-দাওয়া করে আগে ঘুমিয়ে নাও তো।"

একদিন দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর বললাম, "আজ তোকে ছাড়ব না। চল্ এখুনি চিরঞ্জীব স্যারের সাথে দেখা করে আসি গিয়ে।"

ও বলল, "খেপেছ তুমি দাদা! আমার বলে দুপুরের খাওয়ার পর হাই ওঠে। যাবে তো সে আর এমন শক্ত কাজ কী। পুরন-খাদানের দিকে যে রাস্তাটা গেছে তা ধরে পাক্কা তিন মাইল হাঁটলে ভুতুড়ে বাড়ি 'নন্দী-কাস্‌ল্'। স্যার থাকেন সেখানে। আমি বিকালে তোমাকে ভূতগোড়িয়ার জঙ্গল পার করে দিয়ে আসব। সেখান থেকে আরও এক মাইল গেলে ভুতিয়া পাহাড়, তার কোল ঘেঁষে 'নন্দী কাস্‌ল্'। এখন ঘুমোও তো।"

সন্তু ভীষণ ঘুম-কাতুরে। আমার আবার দুপুরে ঘুম আসে না। তাই লীলা মজুমদারের লেখা একটা বই নিয়ে ইজিচেয়ারে আরাম করে বসে জিজ্ঞেস করলাম, "স্যারের কাছে তুই যাবি না?"

খুব বড় একটা হাই তুলে ও বলল, "খেপেছ তুমি! একদিন বিকেলে ওদিকে বেড়াতে গেছি একলা, অমনি খপ্ করে ধরলেন আমাকে স্যার! যত বলি, রাত হয়ে গেলে বাবা বকবেন, কে শোনে সে কথা। টানতে টানতে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে কী যেন সব বিজ্ঞানের বিচ্ছিরি কথা শোনালেন একগাদা। আমার দুবার হাই উঠতেই ভীষণ রেগে বললেন, তুই একটা গণ্ডমূর্খ। যা কবিতা লেখ গিয়ে। ফের যদি এদিকে বেড়াতে আসবি তো মেরে হাড় গুঁড়ো করে দেব। আর যাই ওদিকে! যা বদরাগী উনি।" বলেই পাশ ফিরে শুয়ে ও চোখ বুজল।

আমি আর কী করি, বইটাই পড়তে লাগলাম।

জঙ্গলটা খুব গভীর। তাড়াতাড়ি পার হয়ে ওদিকে পৌঁছতেই বেলা পড়ে এল। সামনে ধু ধু প্রান্তর। দূরে পাহাড়ের সারি। পাহাড়ের কোলেই একদিকে বাড়িটা স্পষ্ট দেখা গেল। সন্তু ওদিকে দেখিয়ে বলল, "ব্যাস, সোজা চলে যাও। আমি কাটি।"

আমি ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "ঐ নির্জন ভুতুড়ে বাড়িতে আর কে কে থাকে রে?"

ও বলল, "কে আর থাকবে। শুনেছি স্যারের ঠাকুর্দার বাবা খাদানের মালিক ছিলেন। সে অনেক দিন আগের কথা। তিনিই খাদানের কাছে থাকবেন বলে বাড়িটা বানিয়েছিলেন। এখন ও বাড়িতে স্যার আর তার বুড়ো চাকর ভজুয়া থাকে। সেও ভীষণ পিটপিটে লোক। যাওনা, গেলেই দেখা পাবে।"

যত কাছে ভেবেছিলাম, বাড়িটা তত কাছে নয়!

বাগানের বন্ধ ফটকের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছি যেই, অমনি বাড়ির ভিতরে কোথায় যেন বুম করে কী ফাটল! ভীষণ আওয়াজ তুলে আমাকে চমকে দিয়ে ভুস ভুস করে কালো ঘন ধোঁয়া পাক খেতে-খেতে সামনের খোলা দরজাটা দিয়ে বার হয়ে এসে চারদিক ঢেকে ফেলল। তার মাঝ দিয়ে কালিঝুল মাখা একজন মাঝ-বয়সী ভদ্রলোক ভীষণ লাফাতে লাফাতে বার হয়ে এলেন।

দেখেই বুঝলাম, ওঁর চোট লেগেছে যত, তার থেকে অনেক বেশি ভয় পেয়েই লাফাচ্ছেন উনি! বাইরে এসেই উনি চেঁচাতে লাগলেন, "ভজুয়া রে, ওরে ভজুয়া, শিগ্‌গির ছুটে এসে দেখ্, আমি বেঁচে আছি কিনা। লাখ টাকার জ্বালানির ফর্মুলাটা একটু ভুলেই বুম হয়ে গেল, স্রেফ্ ধোঁয়া! আবার সব কিছু সেই রাম থেকে শুরু করতে হবে।"

ওঁর লাফানি থামতেই খোঁড়াতে - খোঁড়াতে একজন বুড়ো কোথা থেকে এসেই গজগজ শুরু করল, "তোমাকে আগেই বলেছিলাম, এসব বন্ধ করো। শুনলে না তো। বলি কী হবে চন্দে-সুজ্জে গিয়ে? এদিকে তো হাঁড়ি চড়ে না। নাও, বলো কোথায় চোট লাগল? ছ্যাঁকা-পোড়া লাগলে আলু ছেঁচে পুলটিস দিতে হবে। ঘরে অষুধ বলতে তো চুন-হলুদ, তাও হলুদ আছে কিনা দেখতে হবে।"

একগাল হেসে ভদ্রলোক বললেন, "নাঃ, লাগেনি তেমন। শুধু জামা-কাপড় ফর্দাফাই হয়ে গেছে। যাক গে, মরিনি তো। কানে কেবল তালা ধরে গেছে। তা তোর বকবকানি বেশ শুনতে পাচ্ছি। এক কাপ গরম চা খাওয়াবি? খেয়েই ফরমুলা 'বি ইন্টু জেড্'টা নিয়ে পড়তে হবে। ওটাই ফাইনাল। তারপর দেখবি ঠিক-ঠিক ফিরে যাব আপন গ্রহে। যেখান থেকে এক যুগ আগে আমার ঠাকুর্দার ঠাকুর্দার বাবা ভুল করে চলে এসে-ছিলেন এখানে। চা খাওয়া, নইলে তোকে সঙ্গে নেব না।"

বুড়োর গজগজানি বেড়ে গেল, "কুগ্রহে না পড়লে কেউ অন্য গ্রহে যেতে চায়! ও তুমিই যাও, আমি যাব না।"

রাগে খোঁড়াতে খোঁড়াতে ও চলে গেল।

তখনি হঠাৎ ভদ্রলোক আমাকে দেখতে পেলেন। ভূত দেখার মত চমকে উঠে আর একবার কড়া নজরে দেখেই শাঁ করে ছুটে এসে লোহার ফটকটা ধরে দাঁড়ালেন। আমার আগাপাস্তলা আবার ভাল করে দেখেই মুখস্থের মত বললেন, "এক পা এগিয়েছ কি মরবে, পিছিয়েছ কি মরবে, নড়েছ কি মরবে। যা জিজ্ঞেস করি চটপট জবাব দাও। তুমি শত্রুপক্ষের স্পাই?"

আমি ভীষণ ভয় পেয়ে বললাম, "স্পাই হতে যাব কেন আমি! স্টেশন মাস্টার প্রদীপবাবুর ছেলে আমার পিসতুতো ভাই। বিশ্বেস না হয় জিজ্ঞেস করুন গিয়ে।"

মহা খুশি হয়ে উনি বললেন, "ওঃ তাহলে তো তুমি আমাদের আপন জন। এসো, ভিতরে এসো। তা তুমি বিজ্ঞান পড়ো, না কি কবিতা লেখ? কবিগুলো সব ওঁচা। দুচক্ষে আমি তাদের দেখতে পারি না। যাক্, এতদিনে তাহলে মন খুলে কথা বলার মত একজন লোক পেলাম।"

আমিও খুশি হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "আপনার কাছে চাঁদের পাথর আছে? আমি তাই দেখতেই এসেছি। দেখাবেন আমাকে?"

গেট খুলে দিয়ে উনি বললেন, "এসো ভিতরে এসো তো আগে। তা আগেই পাথর দেখবে? নাকি আমার কারখানা দিয়েই দেখা শুরু করবে? ওদিকে তো সূর্য পাহাড়ের আড়ালে গেল বলে। সন্ধেবেলা এসব জায়গা আবার তেমন ভাল নয়। ওরা সব, —মানে ঐ ভিন গ্রহের ইয়েরা নেমে এসে আমাকে খোঁজাখুঁজি করে। শেষে হয়ত ভুল করে আমি ভেবে তোমাকেই তুলে নিয়ে যাবে। সে হবে বিতিকিচ্ছিরি ব্যাপার।"

এসব কথা শুনে আমি তো হতভম্ব! আমার দিকে এক নজর তাকিয়েই উনি আবার বললেন, "না না তেমন ভয় পাবার কিচ্ছু নেই। চলো, ভিতরে চলো। রাতটা এখানে কাটিয়ে ভোরে ফিরলেই হবে। ভজুয়াটা বিজ্ঞান বোঝে না একদম, কিন্তু যা ফার্স্ট ক্লাস মুর্গির ঝোল রান্না করে না, খাইয়ে দেব।"

আমি ভয়ানক ঘাবড়ে গিয়ে বললাম, "রাতে এখানে থাকা তো হবে না। পিসেমশাই তাহলে বকবেন।"

একথা শুনে উনি চট করে একবার আকাশের দিকে তাকিয়ে কী যেন দেখেই এক চক্কর ঘুরে নিয়ে বললেন, "সর্বনাশ, তাহলে তো হাতে আর বেশি সময় নেই। এখানে হাঁ করে আমরা দাঁড়িয়ে আছি কেন? চলো চলো, ভিতরে চলো। ওদিকে সূর্য তো পাহাড়ের আড়ালে গেলেই অন্ধকার নেমে আসবে। কদিন আগেই তো এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে, তাহলে তো আজই ভিন গ্রহের বাসিন্দারা রাতে আমার খোঁজে আসবে। গ্রহান্তরের বিজলি টর্চ জেবলে ওদিকের ঐ পোড়ো জমির চারপাশে ঘুরে বেড়াবে!

জাদুকর
পি.সি.সরকার
জুনিয়র
ইন্দ্রজাল দেখাচ্ছেন
মহাজাতি সদনে

বাইরে আলো কমে এসেছিল। ভিতরের ঘরেও তাই অন্ধকার। সেই অন্ধকারে সব কিছু যেন কেমন অদ্ভুত দেখাচ্ছিল। সামনে তাকিয়েই আমি চমকে উঠলাম! একটা পেল্লায় বড় নড়বড়ে টেবিলের ওপরে লোহা লক্কড় কাঠ টিন পেরেক ইসকুরুপ দিয়ে সেঁটে তৈরি করা একটা রকেট ছাদের দিকে মুখ তুলে দাঁড়িয়ে আছে!—মাথার ওপরে ছাদটা সেখানে ফুটো, একটা ত্রিপল দিয়ে ঢাকা।

আমাকে থমকে দাঁড়াতে দেখে উনি জিজ্ঞেস করলেন, "কী বুঝছ? এই হল আসলি ব্যোম-যান। আর দাঁড়িও না এখানে। কে জানে, মনে-মনে নকশা ছকে নিচ্ছ কিনা। তা হবে না। খেটে মরব আমি, আর ভোঁ করে ভিন্ গ্রহে পাড়ি দেবে তুমি! মামদো-বাজি! চলো, পাশের ঘরে চলো।"

সে-ঘরের মেঝে ভর্তি চুন-সুরকি। ছাদটা জায়গায় জায়গায় ফাটল ধরে হাঁ হয়ে গেছে। তা দিয়ে আকাশও দেখা যাচ্ছে। ঘরের এপাশে-ওপাশে, দেওয়ালের তাকে, কুলুঙ্গিতে, আনাচে-কানাচে ভাঙা বোতল ফ্লাস্ক বকযন্ত্র আর নানা ধরনের কৌটো ছত্রখান হয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে!

উনি বললেন, "এই হল আমার ল্যাবরেটরি। এই তো কিছুক্ষণ আগেই ফরমুলা 'বি ইনটু ওয়াই' নিয়ে পরীক্ষা করছিলাম। একটু এদিক ওদিক হতেই —বুম! তা হোক গে, ফরমুলা 'বি ইনটু জেড'ই হল গিয়ে আসলি জ্বালানি। তাই দিয়েই রকেট চালিয়ে আমি আমার আপন গ্রহে পৌঁছে যাব। এই পচা গ্রহে আর মানুষ থাকে! ছোঃ ছোঃ!"

এসব কাণ্ড কারখানা দেখে আমার তো আক্কেল গুড়ুম! কী যে বিশ্বাস করব, কী যে করব না, তা বুঝে উঠতে পারছিলাম না।

উনি বললেন, "চলো এবারে আপিস-ঘরে গিয়ে বসা যাক। সেখানেই আমি আমার মাননীয় অতিথিদের সঙ্গে বসে এক কাপ গরম চা হাতে নিয়ে আমার অতীত ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা করি। দেখবে এদেশের কাগজওয়ালারা কেমন এক-নম্বরের একচোখো। বিলেত আমেরিকার কথা ছাপাবে, অথচ খাঁটি দেশী বিজ্ঞানী আমি, আমার কথা ভুলেও একবার ছাপাবে না। ছিঃ ছিঃ।"

শোবার ঘরই আপিস-ঘর। একটা নড়বড়ে হাতল-ভাঙা চেয়ারে আমি কায়দা করে বসলাম। উনি সোজা খাটের বিছানায় আসনপিঁড়ি হয়ে বসেই চোখ বুজলেন। কী যেন ধ্যান করলেন কিছুক্ষণ। চোখ খুলে বললেন, "দেখলে ভজুয়াটার কাণ্ড? এক কাপ গরম চাও এনে দিলে না হতভাগা। এদিকে আমার তো গলা শুকিয়ে কাঠ। লেকচার দেব কী করে? কী জানি, হয়ত চা-ই ফুরিয়েছে। ফরমুলা 'বি ইনটু ওয়াই' নিয়ে এতই মশগুল ছিলাম যে, পকেট থেকে পয়সা বার করে দিতেও মনে ছিল না। যাক্ গে,—রাতে মুর্গির ঝোল আর চাপাটি যা জমবে না! রান্না করে বটে ভজুয়া! তবে হ্যাঁ, ভিন গ্রহের ওরা চলে গেলেই তবে খানা সার্ভ করা হবে। তার আগে নয়।"

আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, "আপনার গিয়ে ঐ আপন দেশ, ভিন গ্রহের বাসিন্দা, এসব কথার তো কোন মানেই আমি বুঝতে পারছি না! ও ব্যাপারগুলো কী?"

"বুঝবে, বুঝবে," উনি মুচকি হেসেই আবার ভীষণ গম্ভীর হয়ে বললেন, "আগে ওরা আসুক, তখন চাক্ষুষ দেখিয়ে সব বুঝিয়ে দেব।"

কথার শেষে হঠাৎ উঠে গিয়ে উনি ঘরের সব দরজা জানালা-গুলো চটপট একদম সেঁটে বন্ধ করে দিলেন। অন্ধকারে হাতড়ে একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে ভাঙা টেবিলের কোনায় বসিয়ে দিয়ে বললেন, "ব্যাস, এখন একদম স্পিকটি নট। ওরা বুঝতেই

পারবে না যে এই ভাঙা ভুতুড়ে বাড়িতেই ব্রহ্মাণ্ডখ্যাত বৈজ্ঞানিক শ্রীচিরঞ্জীব নন্দী লুকিয়ে বসে আছেন। খুঁজে মরুক ব্যাটারা ভাগাড়ে আমাকে।"

আমি কিছুই বুঝতে না পেরে বললাম, "কিন্তু আপনার চাঁদের পাথর তো এখনও দেখলাম না! কোথায় ওগুলো? তাই দেখতেই তো আমার আসা।"

উনি আবার খাটের ওপরে আসনপিঁড়ি হয়ে বসে চোখ বুঁজে মিটিমিটি হাসতে লাগলেন। বললেন, "মুনিদেরও মতিভ্রম হয়। তাই হয়েছিল আমার। তাই প্রথম ব্যোম-যানে চড়ে মনের সুখে মহাকাশ পাড়ি দিয়ে নেমেই দেখি, ও হরি, এ তো আমাদের বাপ-পিতেমোর গ্রহ নয়, এ তো চাঁদ! যাক্‌গে, শেষ পর্যন্ত দুবস্তা চাঁদের পাথরই তুলে নিয়ে ফিরেছি। জানি ও মাটিতে সোনা নেই, তবে ওর থেকেই একদিন আমাকে চাঁদাটিনাম ধাতুটা আবিষ্কার করতে হবে। যাও, ওঘরে গিয়ে আসলি চাঁদের পাথর দেখে এসো।"

পাশের ঘরের মেঝেতে একগাদা নুড়িপাথর ছড়ানো রয়েছে দেখলাম। কলকাতার একজিবিশনে চাঁদের যে মাটি দেখেছি, মোটেও তার মত দেখতে নয়।

অন্ধকারে একটা তুলে পকেটে ভরতে যাব যেই, ওঘর থেকে উনি চাপা উত্তেজিত গলায় ডাক দিলেন, "চলে এসো, চলে এসো শিগ্গির। তারা এসে গিয়েছে। পোড়ো জমির মাঠে আমাকে

গরু-খোঁজ খুঁজতে শুরু করেছে। দেখবে এসো।"

দেখি একটা জানলার খড়খড়ি তুলে উনি বাইরের অন্ধকারের মধ্যে কী যেন দেখছেন। ওঁর পাশে ঝুঁকে পড়েই আমি চমকে উঠলাম! কী আশ্চর্য, সত্যিই কতগুলো অদ্ভুত আলো মাঠময় ছুটোছুটি করছে!

সব কিছু আমার যেন কেমন গোলমাল হয়ে গেল!

উনি ভয়-জড়ানো গলায় ফিস-ফিস করে জিজ্ঞাসা করলেন, "কী বুঝছ?"

ঠিক তখনি কোথা থেকে একখানা লড়ঝড়ে গাড়ি বিচ্ছিরি আওয়াজ তুলে ছুটে এসে থামল বাড়ির সামনে।

আঁতকে উঠে উনি বললেন, "এই সেরেছে, আজ ওরা দেখছি এসেই পড়ল শেষ পর্যন্ত! এখন কী হবে?"

ওর কথা শেষ না হতেই দরজায় ঘা পড়ল দুমদাম করে। স্পষ্ট শুনতে পেলাম পিসিমার গলা, "কী ঘুম রে বাবা! দিনের-বেলায় এতও ঘুমুতে পারে মানুষে!"

আমি হুড়মুড় করে উঠে বসতেই লীলা মজুমদারের লেখা বইখানা ধপ করে পড়ে গেল মেঝেতে।

তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠে সন্তু দরজাটা খুলে দিয়েই বলল, "আমি ঘুমুইনি মা, দাদা ঘুমুচ্ছিল।"

পিসিমা ঘরে ঢুকে বলেন, "খুব হয়েছে। এখন চোখে মুখে জল দিয়ে জলখাবার খেয়ে ইসটিশনে যাও তোমরা দুজনে এখুনি। ইস্কুলের চিরঞ্জীব স্যার সেখানে বেঞ্চে বসে আছেন তোমাদের জন্য। বোধ হয় কলকাতার ছেলের বিদ্যের বহর মাপবেন। নাও, দেরি কোরো না আর। বেড়ানো শেষ করে উনি যদি এখুনেই চলে আসেন তো গুচ্ছের জলখাবারের ব্যবস্থা করতে হবে। তার চে তোমরাই যাও।"

আমি বললাম, "একটা গাড়ি এল যেন মনে হল?"

"এল কী রে! গেল বল,"—বললেন পিসিমা, "ঠিকাদারবাবুর ভাঙা লরিটা চড়েই তো চিরঞ্জীব স্যার এসেছিল এখানে জাঁকিয়ে বসতে। আমিই তো হাঁকিয়ে দিলাম। নইলে অত জলখাবারের হ্যাঁপা পোয়াবে কে বল? যা তোরা শিগ্গির ইসটিশনে।"

পিসিমা চলে যেতেই সন্তু বলল, "প্লিজ দাদা, চিরঞ্জীব স্যারের কাছে চাঁদের পাথরের কথা যেন ঘুণাক্ষরে বোলো না। ওসব ওঁর ভীষণ গোপন কথা তো, তোমাকে বলেছি শুনলে আমার হাড় সত্যিই গুঁড়ো করে দেবেন। ভীষণ বদরাগী উনি। জানো না তো, একদিন রাত্তির বেলা ওঁর ঘরে বসে বিজ্ঞান পড়ছি, এমন সময় দেখি কী, কারা যেন মাঠে আলো হাতে লুকোচুরি খেলছে। দেখে দাঁত-কপাটি লাগে আর কী! ভয়ে স্যারকে বলতেই উনি গর্জন করে বললেন, কী বললি হতভাগা? ভূতে লুকোচুরি খেলছে! গুণ্ডমুর্খ, মার্শ গ্যাসের কথা পড়নি? আলেয়ার কথা শোননি? বলেই ঠাঁই করে এইসান এক গাঁট্টা কষালেন যে, এখনও মাথা আলু হয়ে আছে। তুমি আবার ওঁর গোপন কথা জানতে পেরেছ, তা যদি জানতে পারেন তবে আর আমার রক্ষে নেই। দোহাই দাদা, প্লিজ।"

আমি মাথা চুলকে বললাম, "তা নয় বলব না, কিন্তু নন্দী কাস্‌ল্‌-এ একদিন আমাকে যেতেই হবে। ভীষণ রহস্যময় বাড়ি, না?"

ও খুশি হয়ে বলল, "হ্যাঁ দাদা। কালই চলো না। ঐ তো বাস স্ট্যাণ্ডের সামনে বাজারের পিছনের ঘিঞ্জি গলির মধ্যে বাড়িটা। কতই বা দূরে হবে। আমি তোমাকে নিয়ে যাব।"

ছবি/সুনীল শীল

টগবগে জাদুর খেলা

অ্যাব্রা কি ড্যাবরা—গিলিগিলিগিলি—হোকাস পোকাস-ইন্দ্রজাল-ফুস্‌। কী ভাবছ? কী সব বিদ্‌ঘুটে ব্যাপার, তাই না? আরে না-না, এ এক সাংঘাতিক মন্ত্র যাকে বলে একেবারে ফুস্‌ মন্তর, তাই। আর এই মন্তর বললেই ব্যস, চোখের সামনে কাগজ ছিঁড়ে ফের জুড়ে দেওয়া যায়। বিশ্বাস হচ্ছে না? বেশ, যে-কোনো একদিন চলে যাও সেজা মহাজাতি সদনে। সেখানে বিরাট দলবল নিয়ে ম্যাজিক দেখাচ্ছেন তোমাদের বন্ধু জাদুকর পি সি সরকার, জুনিয়র। হ্যাঁ, সেই পি সি সরকার, যিনি আনন্দমেলার পাতায় তোমাদের নানান মজার ম্যাজিক শিখিয়ে দেন।

সে এক এলাহি কাণ্ড। কত যে অবিশ্বাস্য ঘটনা সব ঘটছে কী বলব। ছোট্ট কমণ্ডলু থেকে বেরুচ্ছে অফুরন্ত জল, শূন্য থেকে হঠাৎ হাজির হচ্ছে পাখি, লম্বা লোক শান্তি পেয়ে হয়ে যাচ্ছে ক্ষুদে মানুষ, জাদুকরের অভিশাপে বন্দিনী-রাজকন্যা শুনো যাচ্ছে মিলিয়ে, জ্যান্ত মেয়ে দুটুকরো হয়ে আবার জুড়ে যাচ্ছে, স্পুটনিকে চেপে চাঁদের দেশে পাড়ি দিচ্ছে দুই মহাকাশযাত্রিনী, খোঁড়া মেয়ে হয়ে উঠছে সুস্থ ও স্বাভাবিক—এমন আরও কত-কত কাণ্ড। আর এই সব কাণ্ড যিনি করছেন সেই পি সি সরকার তো আশ্চর্য এক গল্প-বলা জাদুকর। চোখ-বাঁধা অবস্থায় দিব্য কঠিন-কঠিন অংক কষে দিচ্ছেন, ছ-টা তাস গুনে দেখিয়ে পলকে মাটিতে ফেলছেন একগাদা তাস, বেঁধে দিলেও অদ্ভুতভাবে দর্শকদের পাশটিতে হচ্ছেন হাজির।

তোমাদের তো খু-উ-ব ভালবাসেন। তাই জাপান থেকে তিনটে ভূত নিয়ে এসেছেন পি সি সরকার। আর তোমাদের জন্যে, শুধু তোমাদের জন্যেই, দারুণ মজাদার একটি খেলা করেছেন। 'টগবগে খেলা' তার নাম। দারুণ সুন্দর টগবগে এক জ্যান্ত ঘোড়া চক্ষের নিমেষে শূন্য থেকে আবির্ভূত হচ্ছে মঞ্চে।

মহাজাতি সদন এখন একেবারে রূপকথার এক রাজ্য।

প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়

ফটো / অজয় দত্তগুপ্ত

ইস্টবেঙ্গল দারুণ খেলে জিতেছে

পুষ্পেন সরকার

ইসটবেংগল দারুণ খেলেছে। গতবারের পরাজয়ের শোধ নিয়েছে। গতবার ছিল এক গোলে হার। এবার দু গোলে জিত। কোন্ দল লীগ চ্যামপিয়ন হবে, এখনই বলা যাবে না। দু দলের অনেক খেলা বাকী। তবে এই গুরুত্বপূর্ণ খেলায় জিতে ইসট-বেংগল চ্যামপিয়ন হবার পথে অনেকটা এগিয়ে রইল।

এই প্রসংগে জানিয়ে রাখি, মোহনবাগান এ পর্যন্ত ১৫ বার লীগ জয় করেছে। ১৯ বার রানার্স আপ। ইসটবেংগল ১৪ বার লীগ চ্যামপিয়ন। ১৮ বার রানার্স আপ। ১৯২৫ সাল থেকে এই বছর পর্যন্ত লীগে মোহনবাগান ও ইসটবেংগল ৮৮ বার পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে। ইসটবেংগল জিতেছে ৩৪ বার। মোহন-বাগানের জয়ের সংখ্যা ২৫। ড্র হয়েছে ২৯টি খেলায়। ইসটবেংগল গোল করেছে ৭১টি। মোহনবাগান গোল দিয়েছে ৬৮টি।

খেলোয়াড় বিচার করলে এবারে মোহনবাগান দলে নামী খেলোয়াড় বেশি। ইসটবেংগলে অধিকাংশই তরুণ খেলোয়াড়। অনেকেরই ধারণা ছিল মোহনবাগান জিতবে। কিন্তু ইসটবেংগলের তরুণরা দেখিয়ে দিয়েছে, জয়ের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে খেললে কোন বাধাই জয়ের পথ আটকাতে পারে না।

৯ জুলাই ছিল তরুণদের দিন। দু দলের তরুণ খেলোয়াড়রা মাঠকে মাতিয়ে রেখেছিল। ইসটবেংগলের গোল-রক্ষক ভাস্কর, স্ট্রাইকার মিহির, ব্যাক শ্যামল ব্যানার্জি এবং মোহনবাগানের বিদেশ অন্য সকলকে ছাড়িয়ে যাবার জন্য অসাধারণ হয়ে উঠেছিল।

ভাস্কর তরুণ গোলরক্ষক। গতবছর মোহনবাগান থেকে ইসটবেংগলে এসেছে। ১৯৭৫ সালে আই এফ এ শীল্ড ফাইনালে মোহনবাগানের গোলরক্ষক হিসাবে ইসটবেংগলের কাছে ৫—০ গোলে হেরেছিল। এরপর ভাস্করের সুনাম কিছুটা নষ্ট হয়। ভাস্কর নিজের ভুল-ত্রুটি শোধরাবার জন্য কঠোর অনুশীলন শুরু করে। সে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছে। মোহনবাগান জিততে পারেনি অনেক কারণে। তার একটা প্রধান কারণ ভাস্করের অসাধারণ গোলরক্ষা। কোন শটে হার স্বীকার করবে না, এই দৃঢ় মনোবল নিয়ে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত খেলে ভাস্কর ভাস্বর হয়েছে।

মিহির এই প্রথম খেলল ইসটবেংগলের হয়ে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে। দলে নবাগত। তরুণ খেলোয়াড়রা অনেকসময় বড় খেলায় মনোবল হারিয়ে ফেলে। স্বাভাবিক খেলা খেলতে পারে না। মিহিরকে দেখে মনে হয়েছে, সে সমস্ত ভয়-ভাবনা দূরে ঠেলে দলকে জেতাতে মাঠে নেমেছে। কি আক্রমণ, কি রক্ষণ, সব বিভাগেই মিহির সকলের উপরে। চকিত ভলি শটে তার প্রথম গোল যারা দেখেছে তারা অনেকদিন ভুলতে পারবে না। মিহির বড় খেলোয়াড় হতে পারবে।

লেফ্ট ব্যাক শ্যামল ব্যানার্জিও সমস্ত দর্শকদের প্রশংসা কুড়িয়েছে। বিশেষ করে দ্বিতীয়ার্ধে মোহনবাগান যখন মরিয়া হয়ে গোল শোধের জন্য লড়ছে, তখন শ্যামলকে দেখে মনে হয়েছে অনেকদিনের অভিজ্ঞ খেলোয়াড়। আত্মবিশ্বাস নিয়ে সে

আলোকস্তম্ভের শীর্ষে বিজয়-পতাকা। ফটো/বিশ্বরঞ্জন চক্রবর্তী

শেষ বাঁশি বাজা পর্যন্ত নির্ভুলভাবে নিজের দায়িত্ব পালন করেছে।

এই তিন তরুণ খেলোয়াড়ের সঙ্গে সমরেশ, অধিনায়ক শ্যামল ঘোষ, সুরজিত এবং উলগা ভাল খেলতে পেরেছে বলেই ইসটবেঙ্গলের জয় সম্ভব হয়েছে। ইসটবেঙ্গলের হয়ে খেলে সমরেশ কখনও মোহনবাগানের বিরুদ্ধে কলকাতায় হারেনি। আবার মোহনবাগানের হয়েও ও হারেনি কলকাতার মাঠে ইসটবেঙ্গলের বিরুদ্ধে। শুধু ভাগ্যের জোরে সমরেশ জেতে না। বড় খেলায় ও বড় হয়ে ওঠে নিজের দক্ষতা ও বুদ্ধি দেখিয়ে। প্রায় ৩৫ গজ দূর থেকে ফ্রি কিকে দ্বিতীয় গোলটি সমরেশের পক্ষেই সম্ভব।

মোহনবাগান জিতবে, এরকম আশা করার যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল। প্রসুন ও গৌতম ভারতের সেরা হ্যাফব্যাক। এখনকার ফুটবলে এই দুই হাফব্যাকের উপর বড় দায়িত্ব। রক্ষণকাজে সহায়তা করা ছাড়া আক্রমণকে সব সময় রসদ জোগাতে হয়। গৌতম ও প্রসুন নিজেদের সুনাম রাখতে পারেনি। এ ছাড়া চার ব্যাককেও বহুবার ভুল করতে দেখা গেছে। গোলরক্ষক বিশ্বজিতের দ্বিতীয় গোলটি বাঁচানো উচিত ছিল। ফরোয়ার্ডদের মধ্যে বোঝাপড়া ছিল না। হাবিব ভাল খেলেছে বটে, কিন্তু সহজ গোল করতে পারেনি। একমাত্র বিদেশ ছিল ব্যতিক্রম। বড় খেলা প্রথম খেলল। বল নিয়ে যখনই হরিণের মত ছুটেছে, তখনই ইসটবেঙ্গল রক্ষণভাগে বিপদ দেখা গেছে। মনে হয়েছে, মোহনবাগান গোল শোধ করে দিতে পারে। দলের খেলোয়াড়দের সাহায্য পেলে বিদেশ আরও ভাল খেলত। বিদেশ খেলার মাঠে আরও বড় হবে।

মোহনবাগান-ইসটবেঙ্গলের খেলা সাধারণত ভাল হয় না। দু দলের খেলোয়াড়দের মন খুব বিচলিত থাকে। গোল দেওয়া থেকে গোল না-খাওয়ার দিকে লক্ষ্য থাকে বেশী। ফলে মাঝারি পর্যায়ের খেলা হয়। কিন্তু এবারে খেলা যারা দেখেছে, তারা সত্যি ভাগ্যবান। বিশেষ করে প্রথম ৩৫ মিনিটের খেলা। এ-গোল থেকে ও-গোলে বল গিয়েছে সব সময়ে। যে-কোনও সময়ে যে-কোনও দল গোল করতে পারে, এমন ছিল অবস্থা। খেলায় ছিল তীব্র গতি। দ্বিতীয়ার্ধের খেলা কিছুটা মন্থর হলেও

ভাস্কর ফিস্ট করে গোল বাঁচাচ্ছে। ফটো/বিশ্বরঞ্জন রক্ষিত

মিহির সেদিন দেখবার মতো গোল দিয়েছিল। ফটো/মনোজিৎ চন্দ

উত্তেজনা ছিল শেষ বাঁশি বাজা পর্যন্ত। অনেকদিন পর একটা ভাল খেলা দেখে আনন্দ পেয়েছে সকলে।

খেলায় ভাগ্য একটা বড় জিনিস। ইংরেজিতে বলা হয় 'গেম লাক'। ভাগ্য মোহনবাগানের বিরুদ্ধে ছিল। ইসটবেঙ্গল ভাল খেলে যোগ্য দল হিসাবেই জিতেছে সন্দেহ নেই। কিন্তু খেলার সূচনাতে হাবিব একমাত্র ইসটবেঙ্গল গোলরক্ষককে পেয়ে যদি গোল করতে পারত তাহলে খেলার ফল কী হত বলা শক্ত।

জয়ী দলের সদস্য সমর্থকরা খুশি হয়। আনন্দ করে। উৎসব করে। পরাজিত দলে থাকে ঠিক উল্টো চিত্র। গতবারে মোহনবাগান সমর্থকরা আনন্দ করেছিল। এবার করেছে ইসটবেঙ্গল সমর্থকরা। সেই আনন্দ ও বিষাদ দুই-ই দেখা গেছে। খেলার পর একদিকে ব্যান্ড, বিউগল, কাঁসর, ঘণ্টা, মশাল। আবার অন্যদিকে দুঃখ, ব্যথা, অভিমান। ইসটবেঙ্গল সমর্থকরা আনন্দ করে বেরিয়ে যাবার পরে মাঠ যখন ফাঁকা, তখন দেখেছি মোহনবাগানের দুটি তরুণ সমর্থক গ্যালারিতে বসে নীরবে চোখের জল ফেলছে। জয় পরাজয় খেলায় আছে। হারজিত আছে বলেই তো খেলায় এত আকর্ষণ। খেলোয়াড়োচিত মনোভাব নিয়ে এই হারজিতকে যারা নিতে পারে তারাই সত্যিকারের খেলাকে ভালবাসে।

গতবছর লীগ খেলায় মোহনবাগান জেতার পর রবি বাড়ি থেকে চিংড়ি মাছের মালাইকারি রেঁধে বন্ধু সমীরের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে এসেছিল। এবারে সমীর বাড়ি থেকে ইলিশমাছ ভাজা রবিকে দিয়ে এসেছে। দুই বন্ধু কে কেমন খেয়েছিল সেটা জানা যায়নি।

ফুটবলের জাদুকর

মুকুল দত্ত

গত মাসের আনন্দমেলায় কয়েকজন বিদেশী বড় ফুটবলারের কথা লিখেছি, যাঁরা কলকাতায় খেলে গেছেন। এ মাসে লিখছি আমাদের দেশের সেরা বড় ফুটবলার সামাদের কথা।

ধ্যানচাঁদ যেমন হকি খেলার জাদুকর, তেমনি ফুটবলের জাদুকর ছিলেন সামাদ। ফুটবল খেলা তো নয়, বল নিয়ে দেখাতেন ভানুমতীর খেলা। বিপক্ষের বাধা কাটিয়ে বল নিয়ে তীরের মত এগিয়ে যাবার সময় মনে হত, বল ওঁর পায়ে বাঁধা আছে অদৃশ্য রবারের সুতো দিয়ে। তিন-চারজন খেলোয়াড় ঘিরে ধরেও সহজে ওঁর কাছ থেকে বল কাড়তে পারেনি বা শট করার পথ আগলাতে পারেনি, এমনই ছিল তাঁর পায়ের কাজ। তখনকার জাঁদরেল জাঁদরেল খেলোয়াড়রাও ওঁকে বাধা দিতে গিয়ে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বোকা বনে যেতেন। পায়ের পাতার ডান বাঁ দুটো দিক দিয়ে সমানভাবে ড্রিব্ল করতে পারতেন—ইংরেজিতে যাকে বলে ইনসাইড আউটসাইড ড্রিব্ল।

মাথায় ছ' ফুটের মত লম্বা ছিলেন। দেহের অনুপাতে ঠ্যাং দুখানা ছিল বেশি লম্বা, কিন্তু পুরুষ্ট। মুখে ছিল বিরাট গোঁফ। খেলতেন লেফট আউট পজিশনে। খুবে যে খেটে খেলতেন তা নয়। একেবারে টাচ-লাইন ঘেঁষে পায়চারি করে বেড়াতেন। কাছাকাছি বল দেখলে হাতে তুড়ি দিয়ে কিংবা চোখের ইশারায় নিজ দলের কাউকে তাঁর কাছে বল পাস করার ইঙ্গিত করতেন। বল আয়ত্তে আসার ফাঁকটুকুর মধ্যে দুহাতে বিরাট গোঁফের দুইদিকে একবার জোর মোচড় দিতেন। আমরা যখন সামাদের খেলা দেখেছি, তখন তিনি পড়ন্ত সূর্য। কিন্তু তখনও তাঁর খেলার কী সুন্দর দীপ্তি। তখনও ওইভাবে গোঁফে বড় করে একটা তা দিতে দেখেছি। সামাদের সঙ্গে যাঁরা বহুদিন খেলেছেন, কিংবা যাঁরা তাঁর অনেক খেলা দেখেছেন, তাঁদের কাছে শুনেছি, ওটা ওঁর স্বভাবে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। মানুষের তো কিছু-কিছু মুদ্রাদোষ থাকে। প্রতিভাবানদের ক্ষেত্রে থাকে আরও বেশি।

যে কথা আগে বলছিলাম। বল আসার মধ্যে এই অভ্যাসটুকু পালন করা শুধু মুহূর্তের ব্যাপার। তারপরই শুরু হত বেশ কিছুক্ষণ ধরে পায়ের ভেল্কি। বাধা দিতে এসে কেউ বোকা বনে যেত, কেউ পড়ত ছিটকে, কেউ ঘাসের উপর গড়িয়ে পড়ত। সামাদের পায়ের জাদু দেখে দর্শকরা দিত হাততালি। আবার হঠাৎই হাততালি থেমে যেত, যখন বিপক্ষের কেউ সামাদের কাছ থেকে বল কেড়ে নিত। একার পক্ষে কতক্ষণ বল পায়ে রাখা সম্ভব? এক সময় তো বিপক্ষ বল কেড়ে নেবেই।

গোলে শট করার ব্যাপারে সামাদের কেমন যেন বৈরাগ্য ছিল। কিছুতেই শট করতে চাইতেন না—গোলের সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও। ব্যাককে কাটিয়ে এবং গোলকিপারকেও কাটিয়ে একেবারে বলসহ গোলের মধ্যে ঢুকে পড়াই ছিল লক্ষ্য। এভাবে বহু গোলও করেছেন। তবে ব্যর্থ হয়েছেন অনেক বেশি। গোলকিপার বল কেড়ে নিয়েছে। তার তো হাত দিয়েও খেলার অধিকার আছে। কিংবা সামাদের পায়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে গোল বাঁচিয়েছে গোলকিপার।

এতে সামাদের দলেরই ক্ষতি হয়েছে। ফুটবলের বিজ্ঞ ব্যক্তিরা মন্তব্য করেছেন, "ও খেলা খেলাই নয়—লোক মাতানো, হাততালি আদায় করা। দলের কোন্ কাজে লাগে ও খেলা?" কথাটা অবশ্য সত্য। তখন তো ফুটবলের প্রথা প্রকরণের এত চর্চা ছিল না। থাকলে এবং সামাদকে ফুটবলের ব্যাকরণের নিয়মে বাঁধতে পারলে সামাদ ফুটবল-জাদুকর হতেন না, হতেন ভারতের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ফুটবল খেলোয়াড়। তবু হারজিতের কথা বাদ দিয়ে দর্শকদের আনন্দ দেওয়া এবং নিজে আনন্দ পাওয়া যদি ফুটবল খেলার উদ্দেশ্য হয়, তবে সে উদ্দেশ্য-সিদ্ধিতে সামাদের মত সফল কেউ হতে পেরেছেন কিনা সন্দেহ।

সামাদের আদি বাড়ি ছিল বিহারের পূর্ণিয়ায়। ফুটবলে সহজাত প্রতিভার বলে ফুটবল খেলার জন্যই কলকাতায় এসেছিলেন। খেলেছেন এরিয়ান ক্লাবে, তাজহাট ক্লাবে, স্বল্পসময়ের জন্য মহমেডান স্পোর্টিং ও মোহনবাগানে। বেশিদিন ই বি রেল দলে। খেলার জন্যই রেলে চাকরি পেয়েছিলেন। তাজহাট ক্লাব এখন নেই। তখন খুব নামী দল ছিল। তাজহাট রাজশাহী জেলার একটি জমিদারি এস্টেটের নাম। তাজহাটের রাজা গোপাললাল রায় ছিলেন ফুটবল-রসিক। নিজেও খেলতেন। তিনিই নামী-নামী খেলোয়াড়দের নিয়ে দল গড়েছিলেন। ১৯২৩ সালে দলটি ভেঙে দেন। তাজহাটের শূন্য স্থানেই ইস্টবেঙ্গল ক্লাব আসে দ্বিতীয় ডিভিশনে।

তাজহাট আর ই বি আর, দুই ক্লাবেই সামাদকে খেলতে হয়েছে বেশি সময় দ্বিতীয় ডিভিশনে এবং কলকাতার খোলা মাঠে। সামাদের খেলা দেখার টানেই খোলা মাঠে ভিড় হয়েছে ঘেরা মাঠের চেয়ে বেশি। তখনকার ইউরোপিয়ান বনাম ভারতীয় দল, সিভিল বনাম মিলিটারি, শীল্ডের সময় লোক্যাল বনাম ভিজিটর্স প্রভৃতি প্রতিনিধিত্বমূলক খেলায় সামাদের স্থান ছিল বাঁধা। ১৯২০ সালের আন্তর্জাতিক খেলায় ভারতীয় দলের বিরুদ্ধে ইউরোপিয়ান দল ৪ গোল করেছিল। সামাদ কিন্তু পেয়েছিলেন বেস্ট

প্রকাশিত হল—

পরীক্ষায় বেশী নম্বর তুলতে অদ্বিতীয় অভিনব এক বই !

MADHYAMIK PARIKSHA

Price : Rs. 15/- only

AN ANALYTICAL APPROACH TO EXHAUSTIVE QUESTIONS

1978 & 1979

B. B. KUNDU & SONS

18L, Tamer Lane, Calcutta-9 Phone : 34-7328

প্লেয়ারের পদক। তখন তিনি দ্বিতীয় ডিভিশন টিম তাজহাটের খেলোয়াড়। পরবর্তীকালে ই বি আর-এ খেলার সময় সামাদের জন্য পৃথক আইন করতে হয়েছিল তাঁকে ভারতীয় দলে খেলাতে। কারণ ই বি আর তখন ইউরোপিয়ান টিম হিসাবে চিহ্নিত ছিল। সাহেবরাই তো দল চালাত এবং খেলতও। ইউরোপিয়ান দলের খেলোয়াড় ভারতীয় দলে খেলবেন কীভাবে? তাই সামাদের জন্য পৃথক আইন হল।

পঙ্কজ গুপ্তর মুখে শুনেছি, সিমলায় ডুরান্ড কাপে সামাদের খেলা দেখে বড়লাট দারুণ খুশি হয়েছিলেন এবং একদিন রাজপথ দিয়ে গাড়ি হাঁকিয়ে যাবার সময় হঠাৎ সামাদকে দেখে গাড়ি থেকে নেমে তাঁর পিঠ চাপড়ে 'সাবাশ' জানিয়েছিলেন। এম দত্তরায় বলেছেন, ১৯২৪-এ আই এফ এ দলের প্রথম দূরপ্রাচ্য সফরে সামাদের খেলা দেখে মালয়ের মানুষ পাগল হয়ে গিয়েছিল। সেখানে সামাদ এত জনপ্রিয় হয়েছিলেন যে আই এফ এ দলের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে একজন সামাদ সেজে চমৎকার কোরিকেচার করেছিল। এম দত্তরায় তখনআই এফ-এর সম্পাদক হননি। ছিলেন সফরকারী আই এফ এ দলের অন্যতম খেলোয়াড়।

একটা ঘটনার কথা বলি। অনেকের মুখে শুনেছি, কিছু কিছু পত্র-পত্রিকায় ছাপাও হয়েছে। সৈয়দপুরে ই বি আর ইন্টার ডিস্ট্রিক্ট ফুটবল প্রতিযোগিতায় সামাদের দু'তিনটি শট ক্রসবারে প্রতিহত হবার পর সামাদ চেঁচামেচি শুরু করেন। "ইয়ার্কি পেয়েছ? আমার শট ক্রসবারে লাগবে? এখনই গোল-পোস্ট মাপতে হবে। নিশ্চয়ই ছোট আছে। আমার পায়ের শট একেবারে মাপা।" সামাদের দাবিতে গোল-পোস্ট মাপা হল। দেখা গেল, সত্যিই কয়েক ইঞ্চি খাটো।

নিক্তির ওজনে বা ফিতের মাপে কে এমন শট করতে পারে? কেই বা পারে এমন চ্যালেঞ্জ জানাতে? যিনি পারেন, নিশ্চয়ই তিনি নিজের দক্ষতা ও ক্ষমতা সম্পর্কে পূর্ণ আস্থাশীল।

ভাঙা-ভাঙা বাংলায় কথা বলতে পারলেও সামাদের মাতৃ-ভাষা ছিল উর্দু। খেলার সময় মুখে খইয়ের মত বুলি ফুটত। বন্ধু-বান্ধব এবং সহ-খেলোয়াড়দের বিনা কারণেও বকাঝকা করতেন। কিন্তু যোগ্যের সম্মান দানে ছিলেন যথেষ্ট বিনয়ী।

প্রাক্তন পুলিস কমিশনার পি কে সেন একদিন একটি ঘটনার কথা বলছিলেন। মোহনবাগানের ১৯১১ সালের শীল্ড বিজয়ী দলের রাইট আউট কানু রায় ও তিনি গ্যালারিতে বসে সামাদের খেলা দেখছেন। বিরতির সময়ে কানু রায়কে দেখতে পেয়েই সামাদ তরতর করে উপরে উঠে গেলেন। "ওস্তাদজী, তবিয়ৎ আচ্ছা হ্যায় তো?" বলেই কানু রায়ের হাঁটু স্পর্শ করে অভিবাদন জানালেন। নিজে অত বড় খেলোয়াড়, তবু কানু রায়কে সামাদ ওস্তাদজী বলতেন।

ঘর বেঁধেছিলেন পার্বতীপুরে। দেশভাগের পর চলে গিয়েছিলেন পূর্ব পাকিস্তান রেলের চাকরিতে। ১৯৬২তে গোষ্ঠ পালের পদ্মশ্রী প্রাপ্তির সংবর্ধনা সভার খবর পেয়ে ছুটে এসেছিলেন কলকাতায়, বিনা পাসপোর্টে বিনা ভিসায়। বোধহয় এগুলিও বিরল চরিত্রের লক্ষণ।

বিশ ও ত্রিশের দশকে কলকাতায় যতগুলি আন্তর্জাতিক ম্যাচ হয়েছে, তার মধ্যে ১৯২৭-এর খেলাটি স্মরণীয় হয়ে আছে দুই দলের দারুণ লড়াইয়ে। দুই দলেই ছিলেন বাঘা বাঘা খেলোয়াড়। ইউরোপিয়ান দলের গোলকিপার ডেভিস একাই ছিলেন একশোর মত। বহু ভাল শট আটকে দিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত মোনা দত্তর একটি গোলে ভারতীয় দল জিতে-ছিল। গোলটি করেছিলেন মোনা দত্ত, কিন্তু ছয়-সাতজন খেলোয়াড়কে বোকা বানিয়ে মোনা দত্তর পায়ে বলটি জুগিয়ে দিয়েছিলেন সামাদ। ওই খেলাটির কথা বলতে গিয়ে পুরনো দিনের ফুটবল-রসিকরা আজও বলেন, ফুটবল খেলায় অমন বিদ্যুৎ-চমক আর দেখেননি।

ঝন্টু-মন্টুর গল্প (৯০)

চিত্র-পরাগ রায়
বয়স-১৯ বছর

"সুতানুটি গেজেট"(বাংলা),"ক্যালকাটা পাস্ট প্রেজেন্ট ফিউচার"(ইংরেজী) প্রতিটির দাম এক টাকা, নগদে বা মনিঅর্ডারে সি.এম.ডি.এর অফিস, ৩এ অকল্যান্ড প্লেস, কলকাতা-১৭ তে পাওয়া যাচ্ছে।

এই শহরটা ঝন্টু-মন্টুর মত তোমারও। এই শহরটার ভাল মানে তোমারও ভাল,-ক্যালকাটা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (সি.এম.ডি.এ)

শতবর্ষের সেরা

চিরঞ্জীব

লন টেনিসের সবচেয়ে পুরনো প্রতিযোগিতা উইম্বলডন যখন আবার একটি শতবর্ষ বা দুটি শতবর্ষ পালন করবে, তখন অন্য দু-একজনের মত আরও দুটি নাম অনেকেরই মুখে মুখে ফিরবে। ১৮৭৭ সালে উইম্বলডনের প্রথম চ্যাম্পিয়ন হয়ে যেমন এস ডব্লিউ গোরে লন টেনিসের ইতিহাসে স্মরণীয়, তেমনি এবার প্রথম শতবার্ষিকী প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়ে সুইডেনের বুয়র্ন বর্গ ও ইংল্যান্ডের ভার্জিনিয়া ওয়েড যুগ-যুগান্তর ধরে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

গতবারের পুরুষ সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ন বর্গ খেতাব অক্ষুণ্ণ রাখায় সুইডিশরা নিশ্চয়ই খুশি, কিন্তু ইংল্যান্ডের প্রতিযোগিতায় সেই দেশেরই একটি মেয়ে শতবর্ষের বিজয়-তিলক পরল—এ ঘটনা রীতিমত গর্বের।

একত্রিশ বছর বয়সী ভার্জিনিয়ার সম্পর্কে এবারও কিন্তু টেনিস বিশেষজ্ঞরা আশাবাদী ছিলেন না। কেউ কেউ ভেবেছিলেন : ও তো এতদিন ধরে খেলছে, উইম্বলডনে আসছে এই নিয়ে ষোল বছর। কিন্তু তাঁর অভিজ্ঞতা অনেক। ইতিপূর্বে তিনি যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া ও ইতালিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। ১৯৭৪-এ উইম্বলডনের সেমি-ফাইনালেও উঠেছিলেন সিঙ্গলসে (হারেন মরোজোভার কাছে)। ওই বছরই ভার্জিনিয়া স্লিমস সার্কিট থেকে ফিরে হুইটম্যান কাপ জিতেছেন। জিতেছেন ব্রিটিশ হার্ড কোর্ট চ্যাম্পিয়নশিপস ও ডেওয়ার কাপে। ডাবলসে জিতেছেন মার্গারেট কোর্টের জুড়িতে ১৯৭৩-এ অস্ট্রেলিয়ায় ও ১৯৬৮-তে ইতালিতে। ইতালিতে ১৯৭৩-এও জেতেন। তবে সেবার জুড়ি মরোজোভা। ওই বছর ফ্রেঞ্চ চ্যাম্পিয়নশিপসে জেতেন কোর্টের সঙ্গে। যুক্তরাষ্ট্র চ্যাম্পিয়ন ১৯৭৩-এ। তবে ১৯৬৭ ও ১৯৭৪-এ ব্রিটিশ হার্ড কোর্টে সঙ্গী ছিলেন হেল্ডম্যান। ওয়েডের সর্বাধিক কৃতিত্ব হুইটম্যান কাপের মিক্সড ডাবলসে। এ পর্যন্ত ১৪ বার জিতেছেন। খেলায় অসামান্য সাফল্যের জন্য ১৯৭৩-এ ইংল্যান্ডের রানী তাঁকে এম বি ই খেতাব দেন। তারপর থেকে এ পর্যন্ত ভার্জিনিয়া বিশ্বময় সেরা টেনিস প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে চলেছেন একইভাবে। ভার্জিনিয়া ওয়েড কোথাও সফল, কোথাও পরাজিত। কিন্তু ওঁর লক্ষ্য ছিল এই উইম্বলডন। উইম্বলডন খেতাব না জিতলে টেনিসে

শতবর্ষের চ্যাম্পিয়ন ভার্জিনিয়া ওয়েড

শতবর্ষের চ্যাম্পিয়ন বুয়র্ন বর্গ

কুলীন হওয়া যায় না।

শতবর্ষ প্রতিযোগিতার শুরুতে ওঁর সম্পর্কে তেমন দৃষ্টি পড়েনি বিশেষজ্ঞদের। ওঁর বয়স একত্রিশ। এই বয়সে এমন প্রতিযোগিতায় লড়াই করা সহজ ব্যাপার নয়। কিন্তু সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্ক ও পদার্থ-বিদ্যায় ডিগ্রিধারী ভার্জিনিয়া ওয়েড সকলের সব আশঙ্কা দূর করলেন চ্যাম্পিয়ন হয়ে।

১৯৪৫ সালের ১০ জুলাই যাঁর জন্ম হয়েছিল বোর্নমাউথে, সেই মেয়েটি বরাবর যে অধ্যবসায়ী এবার তার জ্বলন্ত প্রমাণ মিলল। ডারবানের প্রাক্তন ধর্মযাজকের কন্যা দেখিয়ে দিলেন, চেষ্টা করলে কিছু অসাধ্য থাকে না। ১৯৭৪-এ লন্ডনের 'ডেলি এক্সপ্রেস' পত্রিকা নির্বাচিত 'স্পোর্টস উওম্যান অফ দ্য ইয়ার', দোহারা চেহারার ভার্জিনিয়া ওয়েড এবার কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যন্ত সরাসরি জিতলেও সেমি-ফাইনালে প্রথম বাধা পান শীর্ষ বাছাই ক্রিস্ এভার্টের কাছে। কিন্তু ৬—২, ৪—৬ ও ৬—১ গেমে জেতার পর বুঝতে পারেন এবারের খেতাব মুঠোর মধ্যে এসে গেছে। ফাইনালের ফল তো অনেকেরই জানা। বেটি স্টোভে জেতেন প্রথম সেট ৬—৪। দ্বিতীয় সেট চলে যায় ভার্জিনিয়ার অনুকূলে ৬—৩। তৃতীয় সেটের শুরুতে বেটি ৩—০ এগিয়েছিলেন। কিন্তু ভার্জিনিয়ার দৃঢ়তার কাছে শেষপর্যন্ত তিনি দাঁড়াতে পারেননি। প্রতিদিন পাঁচ ঘণ্টা (দুই ঘণ্টা ব্যায়াম+তিন ঘণ্টা খেলা। করে কঠোর অনুশীলনের যথার্থ ফল মিলল।

বর্গের সাফল্যকে বলা হয়েছে তারুণ্যের জয়। কুড়ি বছরে প্রথম এবং পরের বছর আবার উইম্বলডন জয় টেনিস বিশ্বে আলোড়ন এনেছে। ফাইনালে প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা খেলে এবং প্রথম সেটে ৩—৬ হেরেও যেভাবে শীর্ষ বাছাই জিমি কোনর্সকে হারিয়েছেন (৩—৬, ৬—২, ৬—১, ৫—৭ ও ৬—৪), তা ভাবা যায় না।

দ্বিতীয় বাছাই সুইডেনের স্টকহমের কাছে সভারলেজ নিবাসী 'টু হ্যান্ডেড ব্যাক হ্যান্ড'-এর খেলোয়াড় বর্গ ১৯৭৩-এ টেনিস বিশ্বে যে ঝড় এনেছিলেন, এখনও তা অব্যাহত। তিয়াত্তরে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে পরপর হারান আর্থার অ্যাশ, জান কোডেসের মত শীর্ষ-স্থানীয়দের। এবং জেতেন ইটালিয়ান ও ফ্রেঞ্চ চ্যাম্পিয়নশিপসে। উইম্বলডনে বিদায় নেন কোয়ার্টার ফাইনালের আগেই, কিন্তু কমার্শিয়াল ইউনিয়ন গ্রাঁ প্রি-তে স্থান হল চতুর্থ। বর্ষশেষে পৃথিবীতেও স্থান চতুর্থ। সতের বছরের কিশোরটি চমকের পর চমক দেখাতে লাগল। উল্লেখ্য, ওর চাইতে কমবয়সী কারুর কাছে বর্গ হারেনি কোনদিন।

১৯৭৪-এ ইটালিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপসের ফাইনালে হারালেন ইলি নাস্তাসেকে, ফ্রেঞ্চ চ্যাম্পিয়নশিপসের ফাইনালে দুই সেটে পিছিয়ে পড়েও হারান ওরান্টেসকে।

আন্তর্জাতিক টেনিসে যাঁর আবির্ভাব ১৯৭১-এ (জিতেছিলেন অরেঞ্জ বোল), তিনি এত দ্রুত বিশ্বশ্রেষ্ঠ হয়ে উঠবেন, কল্পনা করা যায়? উইম্বলডনের পৃষ্ঠা ওল্টালেই দেখা যাবে, ১৬ বছরের (জন্ম ৬ জুন, ১৯৫৬) ছেলেটি ১৯৭২-এ উইম্বলডন জুনিয়রে চ্যাম্পিয়ন। কিন্তু ১৯৭৩-এ বড়দের বিভাগে উঠেছে সেমি-ফাইনালে। এরও আগে ১৯৭২-এ ডেওয়ার কাপ জিতেছে ওনি পারুনকে হারিয়ে। জিতেছে সুইডিশ চ্যাম্পিয়নশিপসেও। তাই ১৯৭৩-এ স্বদেশের পয়লা নম্বর খেলোয়াড় সে। তবুও বুয়ন বর্গের বালকত্ব ঘোচেনি। ১৯৭৪-এ ইতালিতে জেতার পর টেনিস বিশ্ব তাকে লোক (ম্যান) বলে স্বীকার করে। এই বছরই যুক্তরাষ্ট্রে আমাদের বিজয় অমৃতরাজ একটি সেট ছিনিয়ে নিয়েছিল বর্গের হাত থেকে।

টেনিসের বিস্ময় এই বর্গ দারুণ মেজাজী কোর্টের বাইরে। বছর তিনেক আগে ওয়ার্ল্ড টিম টেনিসে যোগদান নিয়ে যখন আলোড়ন উঠেছিল, তাতে ওঁরও ডাক পড়ে। লোভনীয় অর্থের কথাও বলা হয়। জানানো হয়েছিল, তিন বছর খেললে আড়াই লক্ষ পাউন্ড পাবে। বর্গ বলেছিলেন : আমি এখন খেলতে চাই, অর্থ পরে। টেনিসের দৌলতে বর্গের অর্থের অভাব নেই। ১৯৭৩-এ জীবনের প্রায় শুরুতে শুধু ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ টেনিস থেকে পেয়েছিলেন ৭৬ হাজার ডলার। ১৯৭৪-এর শেষের হিসাবে দেখা গেছে, বিশ্বের টেনিস তারকাদের মধ্যে তাঁর রোজগার চতুর্থ বছরে দু' লক্ষ ৬ হাজার, ১৬০ ডলার। বর্গের দাম গত দু বছরে অনেক বেড়েছিল। এবার বাড়ল আরও।

রোজগারের কথা থাক। ভাবি আমাদের এত বড় দেশে একজনও বর্গ বা একজনও ভার্জিনিয়া হয় না কেন?

উল্যাগানাথন

ফোটো/মনোজিৎ চন্দ

আঁকো

রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

নানান আকারের মাঝেই খুঁজে পেয়েছ মনের মত নক্‌শা, গাছপালা, মানুষ—সব।

এবার শুরু ওই আকারের সাহায্যেই বিশেষ বিষয়কে নানান ভঙ্গিতে দেখা। নমুনা হিসেবে পাখির নানান ভঙ্গি ও ধরন এঁকে দেখিয়েছি। লক্ষ করলে দেখবে, একই আকারের সামান্য হেরফেরে নানান পাখি নানান ভাবে ধরা দিচ্ছে। এ বিষয়ে অবশ্যই তোমায় বিশেষ পাখির সহজ চলাফেরা, রং, গড়ন, ডানা, পালক, ঠোঁট ইত্যাদি দেখতে হবে। এমনভাবে প্রতিটি পাখি দেখতে দেখতেই একদিন দেখবে, সে তোমার ওই আকারের মাঝে ধরা দিয়েছে সহজে।

শেখো

কারিগর

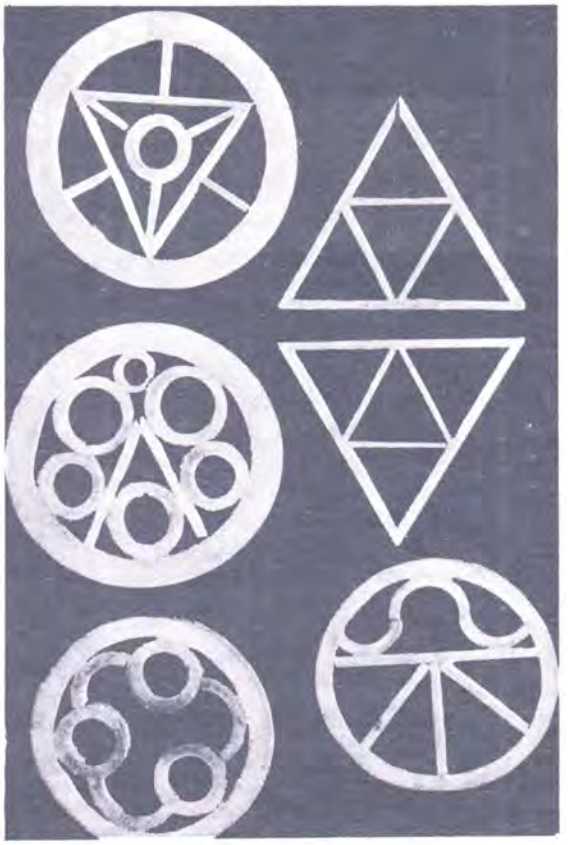

বাঁশের ম্যাট আর কোসটার

গতবার তাল-আঁটি দিয়ে জেনেছ কেমনভাবে ইচ্ছেমত হুঁকো-মুখো হ্যাংলাদের সব মজার মজার মুখ করা যায়। সবচেয়ে বড় ব্যাপার হল—ফেলনা জিনিস দিয়ে খেলনা তৈরি। আর তাতেই আনন্দ সবচেয়ে বেশি।

এবারের কাজের জন্যে লাগবে নানান সাইজের ফাঁপা বাঁশের টুকরো, করাত, ছুরি, সিরিশ কাগজ, কাঁচের ছোট টুকরো আর কাঠ জোড়ার আঠা।

শুরু করো—গোল বাঁশের টুকরোগুলো জলে দিন দুই তিন ভিজিয়ে রেখে করাত দিয়ে চাকা চাকা করে প্রয়োজনমত কেটে নাও। এবার তোমার নকশা মত দরকার হলে ছোট ছোট গোল চাকা কেটে তা পুরো একদিন শুকোতে দাও। শুকিয়ে গেলে সিরিশ কাগজ, ছুরি, পরে কাঁচের টুকরো দিয়ে ঘষে ঝকঝকে করে নকশা মাফিক কাঠের আঠা দিয়ে জুড়ে শেষ করো। গোল নকশা না চাইলে ত্রিকোণ, চৌকো—যেমন ইচ্ছে তেমন আকারে কাজ করতে পারো। তবে সব সময় বাঁশের টুকরো সুন্দর করে চেঁছে পরিষ্কার করে নেবে।

এমনভাবে যত ইচ্ছে কাজ করে খাবার টেবিলে ম্যাট বা কোসটার হিসেবে পেতে বা দেওয়ালের গায়ে আটকে দিয়ে চমকে দাও বাড়ির সবাইকে।

জেনে রাখো:—

(১) বাঁশের নানান সাইজ বলতে মোটা সরুর কম-বেশি।
(২) বাঁশের আঠা হিসেবে 'ফেভিকল' সবচেয়ে ভালো। না পেলে সিরিশ আঠা।
(৩) কাজ শেষ হওয়ার পর পুরো একদিন শুকোতে দাও।
(৪) এ কাজে গোড়ার দিকের বাঁশ নিও না।
(৫) মনে রাখবে বাঁশের পুরু অংশের ওপরই নকশা নির্ভর করে।
(৬) কাজের শেষে ইচ্ছে করলে ভারনিস ব্যবহার করতে পারো।
(৭) কাজ শেষ হলে ছায়ায় শুকোতে দাও, রোদে নয়।

জমসের মজার আস

১০০১ টি পুরস্কার জিতে নাও!

এই পাঁচটি চিত্রের মধ্যে কোন্‌টি খালি জায়গায়
মানানসই হবে?

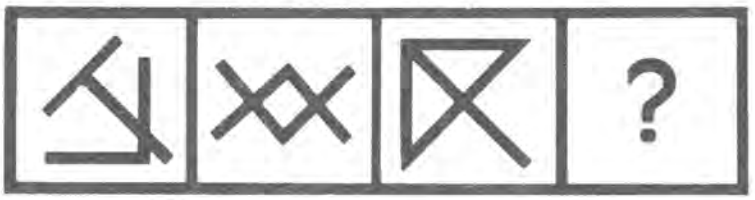

1 2 3 4 5

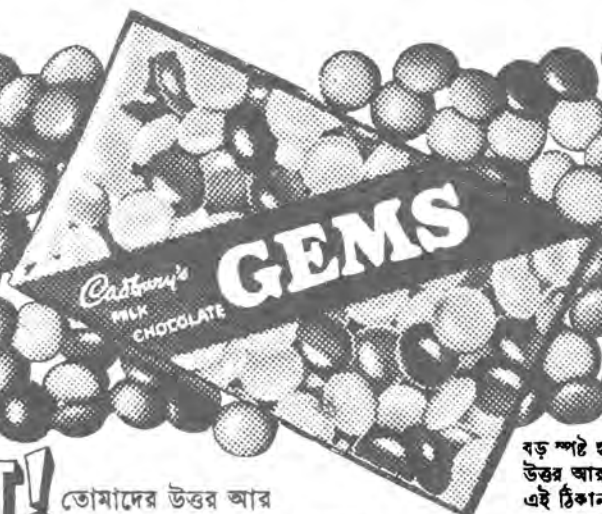

শিগ্‌গীর! তোমাদের উত্তর আর
সেই সঙ্গে ক্যাডবেরীস্ জেমসের
একটি খালি প্লাস্টিক প্যাকেট পাঠিয়ে দিও। প্রথম ১০০১ জন যারা সঠিক উত্তর পাঠাবে তারা প্রত্যেকে ১১ টাকার স্টেট ব্যাঙ্ক গিফ্‌ট চেক পাবে।

বড় স্পষ্ট হরফে শুধু ইংরেজিতে তোমাদের উত্তর আর নাম ও ঠিকানা লিখবে।
এই ঠিকানায় পাঠাও:
"Fun with Gems" Dept D-34
Post Box No. 56, Thane 400 601
উত্তর পৌঁছবার শেষ তারিখ:
৩১শে আগস্ট, ১৯৭৭

রঙ বেরঙের চকলেটে ভরা ক্যাডবেরীস্ জেমস

CHAITRA-C-69 BEN

everest/871/PP-bn